Why Qadiani's are not Muslim's?

কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

কাদিয়ানীরা কেন মুসলিম নয়?

Why Qadiani's are not Muslims?

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

জানুয়ারী '০৪ এ রাজধানী ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ২৭ তম ঐতিহাসিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে কাদিয়ানী ফিত্না প্রসঙ্গে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি কর্তৃক প্রদত্ত বিশদ আলোচনা অবলম্বনে রচিত।

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক লিমিটেড
৬৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

কাদিয়ানীরা কেন মুসলিম নয়?

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী

সত্ব ঃ মুনাওয়ার যীশান সাঈদী

অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশনায় ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক লিমিটেড

৬৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী- ২০০৪

প্রচ্ছদ ঃ কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড কম্পিউটার্স

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ শাকিল কম্পিউটার

মুদ্রণে ঃ ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র।

Why Qadiani's are not Muslims?

Moulana Delawar Hossain Sayedee
Co-operated by Moulana Rafeeq bin Sayedee
Copy ; Monawar Zishan Sayedee
Copyist : Abdus Salam Mitul
Published by Global Publishing network ltd
66 Paridash Road, Bangla Bazar, Dhaka-1100
Phone : 8314541, Mobile : 0171-276479
First Edition 2004, Februari
Fixed Price : 50 Taka Only
Two Doller (U. S) Only

যা বলতে চেয়েছি

আবহমান কাল থেকে ইসলামের চির দুশমন ইয়াহুদী-খৃষ্ট-মুশরিকরা মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নানা ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে থাকে। আর একাজে তারা কখনো নিজেরা প্রকাশ্যে আসে না। পর্দার আড়ালে থেকে মূল কলকাঠি নাড়তে থাকে। নামধারী কোনো মুসলমানকে নির্বাচিত করে তার মাধ্যমেই অমুসলিমরা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার কাজে তারা মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নির্বাচিত করে মুসলমানদের খত্‌মে নবুয়্যাত বিষয়ক আকিদা-বিশ্বাসের ওপরে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে। এই লোকটির মাধ্যমে নবুওয়্যাতের দাবী উত্থাপন করে তারা এক নতুন ফেত্‌না সৃষ্টি করেছে। নবুয়্যাতের দাবী করার কারণে পৃথিবীর সমস্ত মুহাক্কিক আলিম-ওলামা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কাদিয়ানীরা কাফির–তারা মুসলমান নয়।

কাদিয়ানীদের পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশেই সরকারীভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ-বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তাদেরকে সারকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়নি। তবে এব্যাপারে এদেশের আলিম-ওলামা ও সচেতন মুসলমানরা আন্দোলন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে জোট সরকার গত ৮ই জানুয়ারী '০৪ তারিখে কাদিয়ানীদের যাবতীয় প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জোট সরকারের এ সিদ্ধান্ত দেশের তাওহীদী জনতা আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করেছে। কিন্তু বাম-রামপন্থী নাস্তিক, মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ-ধর্মহীন গোষ্ঠীর গায়ে সরকারের সিদ্ধান্ত জ্বালা ধরিয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিরোধী দলীয় নেত্রীও তাদের সুরে সুর মিলিয়েছেন। কেনো কাদিয়ানীরা অমুসলিম এবং কেনো তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে, আমি এর যৌক্তিকতা কোরআন-সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে এ ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমি তাফহীমুল কোরআন ও যিলালিল কোরআনসহ পৃথিবীর বিখ্যাত তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থসমূহের

সাহায্য গ্রহণ করেছি। তথ্য সূত্র গ্রহণ করেছি পত্র-পত্রিকা ও কাদিয়ানী সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও মাত্র সপ্তাহ কালের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ পুস্তিকাটি রচনা করেছি। বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তি মুক্ত করার লক্ষ্যেই আমার এ প্রচেষ্টা। কারণ অনেক রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, কলামিষ্ট, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সরকারী অফিসার ও অনেক শিক্ষিত লোক জানেনই না যে, কাদিয়ানী মতবাদ কি? কেনো তারা অমুসলমান? কিভাবে তারা মুসলমানদের ঈমান-আকীদা হরণ করার কাজে লিপ্ত।

ময়দানের বক্তব্য বহুলাংশে ময়দানেই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ আলোচিত বিষয় স্থায়ীভাবে পৌছে দেয়ার মানসে শব্দধারণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে বর্ণমালায় সুন্দর ও সুপাঠ্য করে সাজিয়েছে আমার সন্তানতুল্য আব্দুস সালাম মিতুল। অনুলিখক এবং প্রকাশকসহ পুস্তকটির সাথে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যার যতটুকু যোগ থাক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল সবাইকে দান করুন এর উত্তম ও যথার্থ বিনিময়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

আরাফাত মঞ্জিল

৯১৪, শহীদবাগ– ঢাকা

আলোচিত বিষয়

দেশে অনেকগুলো ইসলামী দল রয়েছে, কিন্তু আল্লামা সাঈদী

জামায়াতে ইসলামীকে কেন বেছে নিলেন!

কেন তিনি জামায়াতে ইসলামী করেন!

তাঁর নিজের বর্ণনাতেই পড়ুন না!

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি রচিত

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক লিঃ– ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত

মাওলানা সাঈদী সাহেব কর্তৃক রচিত অর্ধশতাধিক গ্রন্থ দেশ-বিদেশের সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা

দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি

আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ

আল কোরআনের মানদন্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা

মানবতার মুক্তি সনদ–মহাগ্রন্থ আল কোরআন

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে– ১ম খন্ড

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে– ২য় খন্ড

শাহাদাতই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ

হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন

শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোনাজাত

এটিএন বাংলায় প্রশ্নোত্তর

কাদিয়ানী পরিচিতি

ইংরেজরা এদেশে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এসে ক্রমশ ক্ষমতার শীর্ষ দেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বিষয়টি সচেতন আলিম-ওলামা অনুভব করতে পেরে সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁরাই সোচ্চার হন। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, জাতির নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিলো, তারাই পার্থিব সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বিনিময়ে ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়ে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য পলাশীর আম্র কাননে অস্তমিত করা হলো। এরপর থেকেই ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে আলিম-উলামা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করতে থাকলেন। ১৮০৫ সনে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা সম্মান-মর্যাদার অধিকারী বুযুর্গ দিল্লীর শাহ্ আব্দুল আযীয (রাহঃ) দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন। সে ফতোয়ায় তিনি ইংরেজদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন এবং এদেশকে 'দারুল হর্‌ব' ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করার আহ্বান জানান। ইসলামের দুশমন দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন ক্ষীণ গতিতে হলেও চলতে থাকে।

এরপর ইসলামের বীর মুজাহিদ সাইয়্যেদ আহ্মাদ শহীদ ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রাহঃ) শত্রুর বিরুদ্ধে ঝড়ের গতিতে মুজাহিদ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু ইংরেজ শক্তি ও তাদের পা চাটা গোলামেরা বিশ্বাসঘাতকদের সহযোগিতায় বালাকোটের ময়দানে ১৮৩১ সনের ৬ ই মে ইসলামের এই বীর মুজাহিদদ্বয়কে সঙ্গী-সাথীসহ হত্যা করেও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে ব্যর্থ হয়। আলিম, ওলামাগণের নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে এবং ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিপ্লব বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের কারণে ব্যর্থ হয়। তারপরেও সশস্ত্র আন্দোলন চলতে থাকে, ইংরেজরা দিশাহারা হয়ে মুসলিম নামধারী লোকদেরকে অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করে তাদের মাধ্যমে দখলদার ইংরেজ বিরোধী যে জিহাদ চলছিলো, সে জিহাদ হারাম বলে এসব দালাল গোষ্ঠী ফতোয়া দিয়ে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা থেকে জিহাদের অনুপ্রেরণা স্তিমিত করার চেষ্টা করে।

শুধু তাই নয়, ইসলামের লেবাসধারী একশ্রেণীর লোকদেরকে রাতারাতি পীর সাজিয়ে তাদের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ও ইংরেজদের পক্ষে ফতোয়া

দিতে থাকে। এসব ফতোয়া যখন ব্যাপকভাবে সাধারণ মুসলমানদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে ফেত্না শুরু করার উদ্দেশ্যে তারা বেছে নিলো পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক স্থানের অধিবাসী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মির্জা গোলাম আহ্মাদ নামক এক জাহান্নামের কীটকে। এই লোকটির নিজের বক্তব্য অনুযায়ী সে ১৮৩৯ বা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে এবং তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছিলো ইংরেজদের রাজকর্মচারী ও তাদের অনুগত ভৃত্য। এই গোলাম আহ্মাদ নামক লোকটি প্রথমে ইসলামের একজন প্রচারক হিসেবে সাধারণ মুসলমানদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করলো। কিছু দিনপর নিজেকে মুজাদ্দীদ হিসেবে দাবী করলো।

তারপর সে নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী হিসেবে দাবি করলো। এরপর সে নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম বলে ফতোয়া দিলো। মির্জা গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানী তার শরীয়াতের ভিত্তি স্থাপন করলো ইংরেজদের শর্তহীন আনুগত্যের ওপরে। ইংরেজদের অর্থপুষ্ট এই জাহান্নামী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা আলিম-ওলামাদের বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করে নানা ধরনের বই-পুস্তক রচনা করে প্রচার করলো এবং তার রচিত বই-পত্রে সে ইংরেজদেরকে এদেশে আল্লাহর রহমত হিসেবে ঘোষণা করলো।

তার অপপ্রচারে যারা প্রলুব্ধ হতো, তাঁদেরকে ইংরেজ রাজশক্তি অর্থ-বিত্ত দিয়ে, উচ্চপদে চাকরীসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলো। ইংরেজ সৃষ্ট ফেত্না মির্জা গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানীর অনুসারীরাই কাদিয়ানী নামে পরিচিত। ইসলামের দুশমন চরম মুসলিম বিদ্বেষী ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের হাইফা শহরেই কাদিয়ানীদের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত এবং সেখান থেকেই পরিচালিত হয় তাদের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম। লন্ডনেও তাদের বিশাল কেন্দ্র রয়েছে। তাদের পৃথক টিভি চ্যানেল রয়েছে। বিজ্ঞাপন ব্যতীত টিভি চ্যানেল-এর কার্যক্রম চালু রাখা অসম্ভব। পক্ষান্তরে এ,এমটিভি চ্যানেল বিজ্ঞাপন ব্যতীতই বিশ্বব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কাদিয়ানীদের টিভি চ্যানেল এ,এমটিভি ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এদের আখ্ড়া রয়েছে। ঢাকায় এদের কেন্দ্র বখ্শী বাজারে। কাদিয়ানীরা মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান হরণ করার কাজে নিয়োজিত।

খত্‌মে নবুয়্যাত সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস

'খত্‌মে নবুয়্যাত' সম্পর্কে কোরআনুল কারীম যে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা করেছে এবং সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর কিতাবের ঘোষণার যে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন, কাদিয়ানী গোষ্ঠী তা বিশ্বাস করে না। তারা খত্‌মে নবুয়্যাত ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আরো অসংখ্য নবীর আগমন ঘটবে। পক্ষান্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যে কোনো ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করেছে, তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনায় সাহাবায়ে কেরাম বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু কাদিয়ানীরা ইসলামের ইতিহাসে সর্বপথম খত্‌মে নবুয়্যাত সম্পর্কে এক অভিনব ও উদ্ভট ব্যাখ্যা আবিষ্কার করে নতুন নবী আমদানীর পথ উন্মুক্ত করেছে। তারা খাতিমুন্নাবিয়্যীন শব্দের অর্থ করেছে 'নবীদের মোহর'- শেষনবী নয়। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে অগণিত নবী আসবে (নাউযুবিল্লাহ) এবং নবী আগমনের সিলসিলা বন্ধ হবে না।

কাদিয়ানীদের এই দাবী সর্বজন বিদিত। এ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের রচিত গ্রন্থ থেকে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করছি। তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে–

خاتم النّبین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النّبین کے معنی یہ ھے کہ آپ کی مہرکے بغیر کسی کی نبوّت کی تصدیق نہیں ھوسکتی، جب مہر لگ جاتی ھے تووہ کاغزسند ھوجاتاھے اور مصدقہ سمجھا جاتا ھے، اسی طرح آنحضرت کی مہر اور تصدیق جسں نبوّت پرنہ ھو وہ صحیح نہیں ھے،

খাতিমুন্নাবীয়্যীন সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ বলেছেন যে, খাতিমুন্নাবীয়্যীন-এর অর্থ তার মোহর ব্যতীত কারো নবুয়্যাত সত্য বলে স্বীকৃত হতে পারে না। যখন মোহর লেগে যায় তখনই তা প্রামাণ্য হয় এবং সত্যরূপে ও স্বীকৃত বলে বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে হযরতের মোহর এবং সত্য বলে যে নবুয়্যাত স্বীকৃতি লাভ করেনি তা খাঁটি এবং সত্য নয়। (মলফুজাতে আহমাদিয়া ৫ম খন্ড ২৯০ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীরা খত্‌মে নবুয়্যাত সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস এভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করেছে –

همیں اس سے انکار نہیں کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم خاتم النّبیّن ہیں مگر ختم کی معنی وہ نہیں جو احسان کاسواد اظم سمجھتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اعلی وارفع کی سراسر خلاف ہے، کہ آپ نے نبوّت کی نعمت عظمی سے اپنی امّت کو محروم کردیا، بلکہ یہ ہیں کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ تصدیق کري گے.....انہں معنوں میں ہم رسول کریم کو خاتم النّبیّن سمجھتے ہیں،

আমরা একথা অস্বীকার করি না যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতিমুন্নাবীয়্যীন। কিন্তু 'খাতাম'-এর যে অর্থ ইহসানের অধিকাংশ লোক গ্রহণ করেছে এবং যা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তা এই যে, তিনি নবুয়্যাতের ন্যায় বিরাট নেয়ামত থেকে নিজ উম্মতকে বঞ্চিত করে গিয়েছেন, তা ঠিক নয়। বরং এর অর্থ এই যে, তিনি নবীদের মোহর ছিলেন। এখন তিনি যাকে নবী হিসেবে স্বীকার করবেন সে-ই নবী হিসেবে গণ্য হবে। আমরা এই অর্থে তাকে খাতিমুন্নাবীয়্যীন বলে বিশ্বাস করি। (আল ফজল পত্রিকা, কাদিয়ান, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯)

খত্‌মে নবুয়্যাত সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লিখেছে–

خاتم مہر کو کہتے ہیں-جب نبی کریم مہر ہوئے تو اگر ان کی امّت میں کسی قسم کانبی نہیی ہوگا تووہ مہر کس طرح ہوئے یا مہر کس پرلگے گی؟

খাতিম মোহরকে বলা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মোহর তখন তার উম্মতের মধ্যে যদি নবী মোটেই না হয়, তাহলে তিনি মোহর হলেন কিভাবে অথবা তা কিসের ওপরে লাগবে? (আল ফজল, কাদিয়ান, ২২ মে, ১৯২২)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে অসংখ্য নবীর আগমন ঘটবে

কাদিয়ানীরা আল্লাহর কোরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করেছে এবং ব্যাখ্যা ঘটিত এই বিরোধ শুধু মাত্র একটি শব্দের মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং অধিক অগ্রসর হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে– শুধু একজন নয় হাজার হাজার নবীর আগমন ঘটতে পারে, এ কথা তাদের বিভিন্ন বিবৃতি এবং ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করেছে। তারা দাবী করে থাকে–

یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کادروازہ کُھلا ہے،

একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও নবুয়্যাতের দরজা খোলা রয়েছে। (হাকিকাতুন্ নবুয়্যাত, ২২৮ পৃষ্ঠা)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষনবী অস্বীকার করে মির্জা গোলাম আহমাদ লিখেছেন–

انہوں‌نے (یعنی مسلمانوں‌نے) یہ سمجھ لیاہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے، ان کایہ سمجھنا خدا تعالی کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایك نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے،

তারা অর্থাৎ মুসলমানেরা বুঝে নিয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালার ভান্ডার শূন্য হয়ে গিয়েছে। তাদের এই কথার মূল কারণ হলো, তারা আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। তা না হলে শুধুমাত্র একজন নবী কেনো, আমি বলবো হাজার হাজার নবীর আগমন ঘটবে। (আনওয়ারে খেলাফত, ৬২ পৃষ্ঠা)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কোনো নবী আগমন করবে না, এ কথা যারা বলে তাদেরকে কাফির কাদিয়ানীদের নেতা গোলাম আহমাদ মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে। **অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী সম্মানিত-মর্যাদাবান আলিম-উলামা ও প্রত্যেকটি মুসলমান মিথ্যাবাদী।** এই ব্যক্তি লিখেছে–

اگرمیری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور

مجھے کہاجائے کہ تم یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اُسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں،

আমার ঘাড়ের দু'দিকে তরবারী রেখে আমাকে যদি বলা হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোনো নবী আসবে না– তুমি একথা বলো। তখনও আমি বলবো যে, তুমি মিথ্যাবাদী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবী আসতে পারে, নিশ্চয়ই আসতে পারে। (আনওয়ারে খেলাফত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

মির্জা গোলাম আহমাদ কর্তৃক নবুয়্যাতের দাবী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আরো অসংখ্য নবীর আগমন ঘটবে, মির্জা গোলাম আহমাদ প্রথমে এই ধারণা প্রচার করলেন। তারপর তিনি স্বয়ং নিজের নবুয়্যাত সম্পর্কে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কাদিয়ানীরা তাকে সত্য নবী হিসেবে গ্রহণ করলো। এক চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মসীহে মওউদ অর্থাৎ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী স্বরচিত পুস্তকসমূহে নিজের নবুয়্যাত দাবীর সমর্থনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি এক স্থানে লিখেছেন যে, আমি নবী এবং রাসূল-এই আমার দাবী। (১৯০৮, ৫ই মার্চ- বদর পত্রিকা)

তিনি অন্যত্র লিখেছেন, আমি খোদার হুকুম অনুসারে একজন নবী। সুতরাং এখন যদি আমি তা অস্বীকার করি, তবে আমার গোনাহ্ হবে। খোদা যখন আমার নাম নবী রেখেছেন তখন আমি কিভাবে তা অস্বীকার করতে পারি। পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি স্থির নিশ্চিতভাবে এই দাবীর ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবো। (লাহোরের আখবারে আম পত্রিকার সম্পাদকের কাছে প্রেরিত মির্জা গোলাম আহমদের চিঠি দ্রষ্টব্য)

মৃত্যুর মাত্র তিনি দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ২৩শে মে তারিখে হযরত মসীহ মওউদ এই পত্রখানা লিখেছেন এবং তার মৃত্যু দিবসে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ২৬শে মে আখবারে আম পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। (রিভিউ অব রিলিজিয়নস পত্রিকার ৩য় বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মির্জা গোলাম আহমাদের অনুসারীরা তার সম্পর্কে লিখেছে—

پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب (یعنی مرزا غلام احمد صاحب) ہرگز مجازی نبی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں،

ইসলামী শরীয়তে নবীর যে অর্থ করা হয় তা অনুসারে হযরত সাহেব অর্থাৎ মির্জা গোলাম আহমাদ কোনো মতে মাজাযী নবী নন বরং প্রকৃত নবী। (হাকিকতুন নবুয়্যাত, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

মির্জা গোলাম আহমাদ নিজের অবৈধ কর্মকান্ড অজ্ঞ লোকদের নিকট বৈধরূপে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ কথা বুঝানোর অপপ্রয়াস পেয়েছে যে, আমি যা কিছুই করি তা সরাসরি ওহীর ভিত্তিতেই করে থাকি। তিনি লিখেছেন—পরে বৃষ্টির অনুরূপ আমার প্রতি খোদার ওহী অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাকে আমার পূর্ববর্তী আকীদা-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দিলেন না। আমাকে স্পষ্টভাবে নবী উপাধি দান করা হলো। (হাকীকাতুল ওহী-১৪৯ পৃষ্ঠা)

গোলাম লিখেছে— যে ব্যক্তি সূচনা থেকেই মুহাম্মাদের উম্মত, সে নবী হতে পারে। এরই ভিত্তিতে আমি উম্মাতীও এবং নবীও। (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া-২৪ পৃষ্ঠা)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বশেষ শরীআত প্রণেতা— এ কথা কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে নবুওয়্যাতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমাদ লা'নাতুল্লাহি আলাইহিও একজন শরীআত প্রণেতা। কারণ এই অভিশপ্ত ব্যক্তি নিজেকে শরীআত প্রণেতা হিসেবে দাবী করে বলেছেন, 'আমার ওপরে যে ওহী অবতীর্ণ হয় তার মধ্যে আদেশও রয়েছে এবং নিষেধও রয়েছে।' (আরবাঈন-নম্বর ৪, ৭পৃষ্ঠা)

উক্ত ব্যক্তি আরো দাবী করেছে— আমিই বুরুযীগতভাবে খাতিমুল আম্বিয়া এবং আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে খোদা বারাহীনে আহমাদিয়ায় আমার নামও আহমাদ রেখেছেন এবং আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই সত্তা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (এক গলতী কা ইযালা)

এই লোকটি নিজেকে সমস্ত নবীদের সমষ্টি দাবী করে বলেছেন, পৃথিবীতে এমন কোনো নবীর আগমন ঘটেনি যার নাম আমাকে দেয়া হয়নি। যেমন বারাহীনে আহমাদিয়ায় খোদা বলেছেন—

خدا تعالی نے مجھے تمام انبیاء علیهم السلام کا مظهر ٹھرایا هے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے هیں میں ادم هوں، میں شیث هوں، میں نوح هوں، میں ابراهیم هوں، میں اسحق هوں، میں اسمعیل هوں، میں یعقوب هوں، میں یوسف هوں، میں موسی هوں، میں داؤد هوں، میں عیسی هوں اور انحضرت صلی اللّٰه علیه وسلم کے نام کا میں مظهر اتم هوں یعنی ظلی طورپر محمد اور احمد هوں۔

খোদা তা'য়ালা আমাকে সমস্ত নবীদের সমষ্টি নির্ধারণ করেছেন এবং সমস্ত নবীদের নাম আমার প্রতিই আরোপ করেছেন। সুতরাং আমিই আদম, আমিই নূহ, আমিই ইবরাহীম, আমিই ইসহাক, আমিই ইয়াকুব, আমিই ইসমাঈল, আমিই মূসা, আমিই দাউদ, আমিই ঈসা ইবনে মারিয়াম এবং আমিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ বুরুযীভাবে। (তাতিম্মায়ে হাকীকাতুল ওহী-৭২-৮৪ পৃষ্ঠা)

নিজেকে নবুয়্যাতের উপযুক্ত দাবী করে গোলাম লিখেছে- **এই উম্মাতের মধ্যে আমাকেই নবীর পদবি দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অন্য সমস্ত লোক এ পদবি লাভের উপযুক্ত নয়।** (হাকীকাতুল ওহী, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে শেষনবী দাবী করে বলেছেন- প্রতিশ্রুত মসীহ ব্যতীত আমার পরে আর কোনো নবী অথবা রাসূল আসবে না। (তাশহীযুল ইযহান-৯ম খন্ড, সংখ্যা-৩, পৃষ্ঠা-৩০)

মহান আল্লাহ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে নামায-রোযা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঘুম তো দূরবর্তী বিষয়, মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা বাকারার ২৪৫ নং আয়াত, যা আয়াতুল কুরসী নামে পরিচিত, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সম্পর্কে বলেন- لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ-

তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে বলেন- আল্লাহ তা'য়ালা কখনো ঘুমান না, তাঁর জন্য নিদ্রা শোভনীয় নয়। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

অথচ কাদিয়ানীদের দাবী হলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা নামায-রোযা আদায় করেন এবং তিনি নিদ্রাও উপভোগ করেন। তারা লিখেছে, আল্লাহ্ বলেন- আমি নামায-রোযা আদায় করি, জেগে থাকি এবং নিদ্রাও উপভোগ করি। (আল বুশরা, ১২ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা মারিয়ামের ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের সম্পর্কে বলেছেন- وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا-

তিনি কখনো ভুল করেন না এবং তিনি কোনো কিছু ভুলে যান না।

সূরা ত্বাহা-এর ৫২ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তৎকালীন ফিরাউনের এক প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহর গুণাবলী এভাবে প্রকাশ করেছেন- لاَ يَضِلُّ رَبِّىْ وَ لاَ يَنْسٰى-

আমার রব না ভুল করেন, না ভুলে যান।

অথচ মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী দাবী করেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, তিনি ভুল করেন। এই ব্যক্তি মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে লিখেছে- আমি আল্লাহ্ রাসূলদের কথা কবুল করি, আমি ভুলও করি এবং সঠিকও করি। (আল বুশরা, ২ খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তা'য়ালার সত্ত্বা সম্পর্কে অভিশপ্ত মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী লিখেছেন- একবার আমি কাশ্ফের অবস্থায় খোদার সামনে অনেকগুলো কাগজ রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, খোদা তা সত্যায়িত করবেন এবং নিজের হাতে স্বাক্ষর করবেন। অর্থাৎ যা কিছু হওয়ার জন্য আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি তা যেন হয়ে যায়। এরপর খোদা লাল কালি দিয়ে কাগজগুলোয় স্বাক্ষর করে কলমের নীবের কালি ঝেড়ে ফেলে দিলেন এবং সে কালি আমার ও আব্দুল্লাহর (মির্জার এক শিষ্য) পরিধেয় বস্ত্রে এসে পড়লো। কাশ্ফের অবস্থার অবসান হলে আমার ও আব্দুল্লাহর কাপড়ে লাল কালির চিহ্ন দেখলাম। (তিরয়াকুল কুলুব- ২২ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামী মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী আল্লাহর আকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন-

ایک ایسا وجود اعظم جس کے بیشمار ہاتھ بیشمار پیر ہیں

اور ہر ایک عضواس کثرت سے ہیں کہ تعداد سے خارج اور

لاانتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس کی تاریں بھی ہیں،

আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যে, এই মহাবিশ্বের চিরস্থায়ী সত্তার এমন এক প্রকান্ড দেহ রয়েছে যাতে অসংখ্য হাত-পা রয়েছে। তার অগণিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। এগুলোর দৈর্ঘ ও প্রস্থ সীমাহীন। তার প্রকান্ড দেহে তারের অসংখ্য যোগসূত্র রয়েছে যা সব দিকে ছড়িয়ে রয়েছে এবং তা যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ দিচ্ছে। (তাওহীদুল মারাম-৭৫ পৃষ্ঠা)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি মারাত্মক অপবাদ দিয়ে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর এক শিষ্য কাযী ইয়ার মুহাম্মাদ লিখেছে– হযরত মসীহ মওউদ গোলাম আহমাদ নিজের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কাশ্‌ফের অবস্থা তার ওপর এমনভাবে চেপে বসলো যে, তিনি যেন একদল স্ত্রী লোক। আর আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গমেচ্ছা তার ওপর চাপিয়ে দিলেন। (ইসলামী কোরবানী, ৩৪ পৃষ্ঠা)

মির্জা গোলাম আহমাদ নিজেকে খোদার সন্তান দাবী করে লিখেছেন– **আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, তুমি আমার পানিতে (বীর্যে) তৈরী হয়েছো আর অন্যরা ভীরুতা থেকে তৈরী হয়েছে। শোন হে আমার পুত্র! হে সূর্য! হে চাঁদ! তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে। আমি তোমার হেফাজত করবো। খোদা তোমার মাঝে নেমে এসেছেন। তুমি আমার এবং সমস্ত সৃষ্টির মাধ্যম।** (আনজামে আতহাম, ৫৫ পৃষ্ঠা, তাযকিরা, ২৪২ পৃষ্ঠা, আল বুশরা, প্রথম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, কিতাবুল বিরবিয়া, ৭৫ পৃষ্ঠা)

গোলাম আহমাদ কর্তৃক খোদা দাবী এবং খোদার পুত্র বলে ঘোষণা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে মির্জা গোলাম আহমাদ বলেছে– আমি কাশফের অবস্থায় অনুভব করলাম, আমি একজন যুবতী নারীতে পরিণত হলাম আর আল্লাহ হলেন এক বলিষ্ঠ দেহের যুবক। তিনি আমাকে ব্যবহার করলেন। আল্লাহ আমাকে বলেছেন, তিনিই আমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমি যা করতে চাইবো, কুন বা হও বললেই তাই হয়ে যাবে। সুতরাং আমিই স্বয়ং খোদা।'

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে এমন অসংখ্য ঘৃণ্য উক্তি করেছে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। তার এসব উক্তি একত্রিত করলে এক বিশাল গ্রন্থ রচিত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে যে কাদিয়ানী গোষ্ঠীর এমন জঘন্য ধারণা,

এরপরও কি তাদেরকে মুসলিম সমাজের অন্তর্গত একটি সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করা যাবে? শুধুতাই নয়, এই গোলাম নিজেকে খোদা দাবী করেছে এবং খোদা নাকি তাকে নিজের পুত্র বলে উল্লেখ করে তার কাছে ওহী অবতীর্ণ করেছে। এ সম্পর্কে গোলাম তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে লিখেছে-

رايتني فى المنام عين الله وتيقنت اننى هو دخل ربى على وجودى وكان كل غضبى و حلمى وحلوى ومرى....اسمع ولدى..انت منى بمنز لة ولدى.....

আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি স্বয়ং খোদা এবং বিশ্বাস করলাম যে, আমি খোদাই হচ্ছি। খোদা আমার দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তুমি শোন! হে আমার পুত্র। তুমি আমার নিকট আমার সন্তানের তুল্য। (আইনায় কামালাত, ৪৪৯-৪৫০ পৃষ্ঠা, তাওজিহে মারাম, ৫০ পৃষ্ঠা, হাকিকাতুল ওহী, ৮৬ পৃষ্ঠা)

কোরআন-হাদীস সম্পর্কে কাদিয়ানীদের ধারণা

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার সাথে কাদিয়ানীদের ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের যোজন যোজন পার্থক্য রয়েছে। গোলাম আহমাদ দাবী করেছে, তার কাছে হযরত জিবরাঈল ওহীসহ আগমন করে থাকেন এবং তার প্রতি যে কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার নাম আল কিতাবুল মুবীন এবং এই কিতাব ২০ পারায় বিভক্ত। এই কিতাবের মর্যাদা পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের তুলনায় অধিক এই কিতাব অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও তিলাওয়াত করা জরুরী। তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, তার (গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী) প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের বরকত ও কল্যাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোরআনের মত এতই অধিক যে, কোনো নবীর প্রতি অবতীর্ণকৃত কিতাবের তুলনায় কম নয়। বরং তাদের অধিকাংশের কিতাবের চেয়ে অধিক বেশী। (আল ফযল পত্রিকা, কাদিয়ান, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯১৯)

কাদিয়ানীরা লিখেছে- গোলাম আহমাদের প্রতি যে কিতাব নাজিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করে যে স্বাদ, বরকত ও কল্যাণ লাভ করা যায় তা অন্য কোনো কিতাব অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াত করেও লাভ করা যায় না। যারা কাদিয়ানীদের কিতাব তিলাওয়াত করবে তারা হতাশায় পতিত হবে না। (আল ফযল পত্রিকা, কাদিয়ান, ৩ এপ্রিল-১৯২৮)

শুধু তাই নয়, কাদিয়ানীদের নেতা মির্জা গোলাম আহমাদ কোরআন হাদীসকে বাতিল করে দিয়েছে। তার দাবী হলো, তার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়, তার মোকাবেলায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের কোনো গুরুত্ব নেই। কোরআন যে আল্লাহ নাযিল করেছেন, সেই আল্লাহকে যখন কেউ দেখেনি, সুতরাং সেই কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করা গুরুত্বহীন বিষয়। যেসব সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মৃত মানুষের বর্ণনার কোনো মূল্য নেই। এই অভিশপ্ত লোকটি লিখেছে–

هَلِ النَّقْلُ شَيْئٌ بَعْدَ اِيْمَاءِ رَبِّنَا.................وَاَنْتُمْ عَنِ الْمَوْتٰى رَوَيْتُمْ فَفَكِّرُوْا–

আমার প্রতি আমার খোদা যে ওহী অবতীর্ণ করে থাকেন, তার মোকাবেলায় হাদীসের কি গুরুত্ব থাকতে পারে? আর হাদীস তো খন্ড-বিখন্ড হয়ে গিয়েছে। তুমি আমার কাছে এমন অবতরণকারীর কথা বলছো, যাকে তুমি দেখোনি। তুমি জানো কল্পিত বিষয় কোনো দলিল-প্রমাণ নয়। আমি তোমাদের মত কল্পনায় বিশ্বাস করি না। আমি সেই অমর খোদার কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আর তোমরা মৃত মানুষের বর্ণনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছো। সুতরাং তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। (ইযাজে আহমাদী-৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব মহান ব্যক্তি নিজের চোখে দেখেছেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁকে নিজের সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে অনুসরণ করেছেন, সেসব মহান ব্যক্তিদেরকেই সাহাবায়ে কেরাম বলা হয়েছে এবং তাঁদের সর্বাধিক সম্মান-মর্যাদার কথা আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন। পক্ষান্তরে মির্জা গোলাম আহমাদ লিখেছে– তাকে যারা দেখেছে, তার মতবাদ গ্রহণ করে তাকে অনুসরণ করেছে, তারাও সাহাবী। (খুতবায়ে ইলহামিয়া-১৭১ পৃষ্ঠা)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও সম্মতিকেই ইসলামী শরীয়াতে হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল যা কিছুই করেছেন ও বলেছেন এবং যে ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেছেন, তার প্রতি মহান আল্লাহর সমর্থন ছিল। সুতরাং কোরআনের পরেই হাদীসের গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীদের অনুসারীদের মতে হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ আমরা আল্লাহর রাসূলকে চোখে দেখিনি এবং তাঁর হাদীস নিজের কানেও শুনিনি। যা কিছু

শুনেছি ও পেয়েছি তা অন্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে। সুতরাং অন্যের মাধ্যমে যা কিছু এসেছে তা অবশ্যই সংশয়পূর্ণ। পক্ষান্তরে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে আমরা চোখে দেখেছি, তার কথা নিজের কানে শুনেছি। অতএব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের তুলনায় আল্লাহর রাসূল গোলাম আহমাদের কথা বা হাদীস অধিক বিশুদ্ধ। (আল ফযল, ২৯ এপ্রিল, ১৯১৫)

মক্কা-মদীনা ও হজ্জ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস

মক্কা ও মদীনা মুসলমানদের কলিজার টুকরা। একজন মুসলমানের আজন্ম স্বপ্ন যে, সুযোগ আসা মাত্রই সে হজ্জে গমন করে আল্লাহর ঘর যিয়ারত করবে এবং মদীনায় প্রাণ প্রিয় রাসূলের রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের সবটুকু প্রেম, ভালোবাসা উজাড় করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাবে। অথচ কাফির কাদিয়ানীরা মুসলমানদের এই কলিজা ধরেই টান দিয়েছে। তারা লিখেছে– কাদিয়ান নামক স্থানের সম্মান-মর্যাদা মক্কা-মদীনার তুলনায় অধিক। এটা জান্নাতের একটি টুকরা। এখানে যে কবরস্থান রয়েছে সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম প্রেরণ করে থাকেন। কাদিয়ানের উপাসনালয়গুলো মক্কা-মদীনা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের চেয়ে উত্তম এবং এটা মুসলমানদের কিবলা। এটা খোদার সিংহাসন এবং এখানে খোদার নূর অবতীর্ণ হয়। এখানকার প্রত্যেক ইটে খোদার নিদর্শন রয়েছে। এখানকার যমীন প্রাচুর্যময় এবং এখানে বরকত অবতীর্ণ হয়। কাদিয়ান নামক এই স্থান পৃথিবীর নাভি এবং এটা সমস্ত পৃথিবীর মা। এই স্থান থেকেই সমস্ত দুনিয়া বরকত ও ফায়েয লাভ করতে পারে। এই স্থানে যে ব্যক্তি আগমন করবে না, তার ঈমান নেই। এই স্থান থেকেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গিয়েছেন। এখন মক্কা-মদীনার দুধ শুকিয়ে গিয়েছে, এখন কাদিয়াননের দুধ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও সতেজ রয়েছে। (আল ফযল পত্রিকা, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯২৯, ৩ জানুয়ারী, ১৯২৫, ১ জানুয়ারী, ১৯২৯, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩২, আনোয়ারে খিলাফত, ১১৭ পৃষ্ঠা, খুতবায়ে ইলহামিয়া, ২২ পৃষ্ঠা, বারাহীনে আহমাদিয়া, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে মক্কায় উপস্থিত হয়ে হজ্জ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমানের জীবনে অন্তত একবার মক্কায় গিয়ে হজ্জ আদায় করতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি সামর্থ থাকার পরেও জীবনে হজ্জ

আদায় না করে তাহলে বড় ধরনের গোনাহ্গার হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। আর কেউ যদি হজ্জকে অস্বীকার করে তাহলে সে আর মুসলমান থাকবে না। কারণ হজ্জ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। পক্ষান্তরে মির্জা গোলাম আহমাদের অনুসারীরা কাদিয়ান নামক স্থানে প্রত্যেক বছর যে সম্মেলন করে থাকে, এটাকেই তারা হজ্জ হিসেবে পরিগণিত করে। **তারা বলে থাকে, মির্জা গোলাম আহমাদকে বাদ দিয়ে যে ইসলাম থাকে তা শুষ্ক ও প্রাণহীন। অনুরূপভাবে কাদিয়ানের এই হজ্জকে বাদ দিয়ে মক্কায় গিয়ে যে হজ্জ করা হয় সেটাও শুষ্ক ও প্রাণহীন।** হজ্জের সময় যেমন স্ত্রীসহবাস, দুষ্কর্ম ও ঝগড়া-বিবাদ করা নিষেধ, অনুরূপভাবে কাদিয়ানের এই হজ্জে আগমন করেও ঐসব কর্ম করা নিষেধ। (বরকতে খিলাফত, পয়গামে সুলেহ, ১৯ এপ্রিল, ১৯৩৩, আল ফযল, ৫ জানুয়ারী, ১৯৩৩)

কাদিয়ানীদের হজ্জ নেই

ইসলামের সামগ্রীক রূপ অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে অথবা সাধারণ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ না করার কারণে মুসলমানদের মধ্যে কতক ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে, কিন্তু মৌলিক বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর গুণাবলী তথা তাওহীদ, রিসালাত-খাত্মে নবুয়্যাত, আখিরাত, আসমানী কিতাব, ফেরেশ্তা, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়– যা সম্পূর্ণ ঈমান-আকিদার সাথে জড়িত, এসব বিষয়ে কোনো মুসলমানের মধ্যে মতপার্থক্য **নেই। পক্ষান্তরে কাদিয়ানীরা যাবতীয় মৌলিক বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বিপথগামী করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।** তারা যেসব বিষয়ে বিভ্রান্তি করেছে, তা সম্পূর্ণ ঈমান-আকীদার সাথে জড়িত। এসব মৌলিক কারণে অধিকাংশ মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। **তারা মক্কায় উপস্থিত হয়ে হজ্জ আদায় করাকে সঠিক মনে করে না। মক্কার তুলনায় মির্জা গোলাম আহমাদের জন্মস্থান কাদিয়ানকেই অধিকতর উত্তম বলে বিবেচিত করে এবং সেখানে যে সম্মেলন করে থাকে, সেটাকেই তারা হজ্জ বলে বিবেচনা করে। কাদিয়ানীরা পবিত্র মক্কা-মদীনা ও আরাফাতের ময়দানের চাইতে তাদের নবী (?) গোলামের জন্মস্থান কাদিয়ানকে বেশী পবিত্র বলে বিশ্বাস করে।**

কোরআন-সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে ঈমান-আকীদাগতভাবে অমুসলিম হওয়ার কারণে সউদী আরবের বিশ্ব-বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের ফতোয়া অনুযায়ী সউদী সরকার

কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে তাদেরকে মক্কা-মদীনায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুতরাং যাদের জন্য মুসলমানদের কলিজা মক্কা-মদীনায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ, তারা অবশ্যই অমুসলমান এবং বাংলাদেশেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে মুসলামনদেরকে বিভ্রান্তি মুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্তভাবে জরুরী। কারণ এরা মুসলিম পরিচয়ে, মুসলিম নাম ও বেশ-ভূষা ধারণ করে ইসলামের ছদ্মাবরণে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানদের ঈমান হরণ করার কাজে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, কাদিয়ানীরা এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধেও সুগভীর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। এ জন্য দেশের স্বার্থে সরকারীভাবে তাদের পরিচয় নির্ধারণ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সময় ক্ষেপণ করলে ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

কাদিয়ানীদের পৃথক খোদা

সাধারণ মুসলমানদের সাথে কাদিয়ানীদের শুধু মির্জা গোলাম আহমাদের নবুয়্যাত দাবীর ভিত্তিতেই নয় বরং তাদের স্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী সকল বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কাদিয়ানীদের মুখপত্র আল ফজল পত্রিকায় ১৯১৭ সালে ২১ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'তোলাবা কো নাছায়েহ' শীর্ষক কাদিয়ানী খলিফার বক্তৃতা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কাদিয়ানী ছাত্রদের সামনে আহমাদীদের সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের পার্থক্য কতটা তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন–

ورنه حضرت مسیح موعودنے تو فرمایا هے که أن کا (یعنی مسلمانوں‌کا) اسلام اور همارا اور، ان کا خدا اور هے اور همارا اور، همارا حج اور هے ان کا حج اور، اسی طرح ان سے هربات میں اختلاف هے–

নতুবা হযরত মসীহে মওউদ তো এই কথাও বলেছেন যে, তাদের অর্থাৎ মুসলমানদের ইসলাম পৃথক, আমাদের ইসলাম পৃথক, তাদের খোদা পৃথক, আমাদের খোদা পৃথক, আমাদের হজ্ব পৃথক, তাদের হজ্ব পৃথক, এভাবে তাদের সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের বিরোধ রয়েছে।

জিহাদ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস

জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। এ সম্পর্কে আমি আমার লেখা 'শাহাদাতই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। জিহাদ হচ্ছে ইসলামী জীবনের স্পন্দন, প্রাণশক্তি, অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। জিহাদই মুসলমানদের উন্নতির সোপান, এই কাজ থেকে বিরত থাকার অর্থই হলো, মুসলিম হিসেবে পৃথিবী থেকে নিজের নাম-নিশানা মুছে দেয়া। বর্তমানে মুসলমানরা জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে বলেই গোটা দুনিয়ার অমুসলিম শক্তির দাসত্ব করতে তারা বাধ্য হচ্ছে। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রকেই জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়, এই জিহাদে আন্তরিকভাবে লিপ্ত না থাকলে কোন মুসলমানের পক্ষে ঈমানদার থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। একজন মানুষ যে মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করে তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে, সেই মুহূর্ত থেকেই জিহাদ করা তার ওপরে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন থেকেই শুরু হয় তার জিহাদী জীবন। এই জিহাদ নিরবচ্ছিন্নভাবে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। ঈমান আনার মুহূর্ত থেকে আল্লাহ বিরোধী শক্তির সাথে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা ঘটে, যে সংগ্রামমুখর জীবনের সূত্রপাত হয়, এই সংগ্রামী জীবন থেকে ঈমানদারের অবসর ঘটে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এই সংঘাত ও সংগ্রাম থেকে মুমিন জীবনে মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম গ্রহণ করার সামান্যতম অবকাশ নেই। নেই শৈথিল্য প্রদর্শনের কোন সুযোগ। কারণ যখনই সে জিহাদের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, আল্লাহ বিরোধী তাগুতী শক্তি সেই মুহূর্তেই তার ঈমান হরণ করার লক্ষ্যে চথুরমুখী আক্রমন শুরু করবে।

জিহাদের তিনটি অর্থ রয়েছে। একটি অর্থ হলো, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা–অর্থাৎ প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে প্রাণ দেয়ার মতো পর্যায়ে উপনীত হওয়া। আরেকটি অর্থ হলো, বড় ধরনের প্রচেষ্টা চালানো। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজের যাবতীয় উপায়-উপকরণ নিয়োজিত করা। জিহাদান কাবিরা তথা বড় ধরনের জিহাদের আরেকটি অর্থ হলো, ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কোন একটি দিকও অপূর্ণ না রাখা এবং প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ময়দান ত্যাগ না করা। প্রতিপক্ষের অনুকুল শক্তি ময়দানে যেসব স্থানে সক্রিয় রয়েছে, ময়দানের সেসব স্থানে নিজের শক্তি নিয়োজিত করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যেসব ক্ষেত্রে কাজ করার প্রয়োজন হয়–সেসব দিকে কাজ করা। যেখানে নিজের

ব্যবহার ও মধুর আচরণ দিয়ে জিহাদ করার প্রয়োজন, সেখানে তা প্রয়োগ করা। যেখানে কথা দিয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে জিহাদ করা প্রয়োজন, সেখানে তা করা। যেখানে লেখনী দিয়ে জিহাদ করার ক্ষেত্র রয়েছে, সেখানে লেখনী শক্তি প্রয়োগ করা। যেখানে অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেখানে অস্ত্র ধারণ করা। অর্থাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঈমানদারকে জিহাদ করতে হবে তার নিজের নফসকে আল্লাহর বিধানের অনুগত বানানো এবং নফসের যাবতীয় অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য। তারপর শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে তার প্ররোচনা প্রতিহত করার লক্ষ্যে। জিহাদ করতে হবে মানবীয় প্রভুত্ব তথা জালিমদের বিরুদ্ধে তাদের জুলুম বন্ধ করার জন্য এবং জিহাদ করতে হবে আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তাদের কুফরী কর্মকান্ড প্রতিরুদ্ধ করার লক্ষ্যে। জিহাদ করতে হবে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম ঈমান সহকারে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে–আল্লাহর নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে। জিহাদের বিষয়ে একটি কথা স্পষ্ট স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ যে বিকৃত ধারণা পৃথিবী ব্যাপী প্রচার করেছে এবং করছে, তা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, তাদের চিন্তার জগৎ ইসলামের জিহাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য থেকে মুক্ত। তারা রক্তক্ষয়ী অকারণ যুদ্ধ আর ইসলামের জিহাদকে সমান্তরাল দৃষ্টিতে অবলোকন করে থাকে। পক্ষান্তরে ইসলাম যুদ্ধ নয়-জিহাদের বিধান মানব জাতির সামনে পেশ করেছে।

এ কথা আমি সূচনাতেই উল্লেখ করেছি যে, কাদিয়ানী মতবাদ পরিপুষ্টি লাভ করেছে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় এবং ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরাই এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই অমুসলিম শক্তির অন্যায় কার্যাবলীর বিরুদ্ধে কোনো মুসলমান যেন জিহাদে অবতীর্ণ না হয়, এ জন্যই তারা মুসলমানদের মধ্যে একটি দালাল গোষ্ঠী তৈরী করেছিল, যারা জিহাদ হারাম বলে ফতোয়া জারী করেছিল। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীও মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যে বৃটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় কাদিয়ানীরা ধীরে ধীরে বর্তমানে দুশ্চিন্তা করার মত দীর্ঘ সংখ্যায় পৌছেছে সেই খৃস্টান বা ইংরেজ শাসনের প্রতি তারা সব সময়ই উচ্ছ্বসিত ও কৃতজ্ঞতাপ্রবণ। ইংরেজ শাসনের আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী বৃটিশ সরকারের প্রতি নিজ কাজের ফিরিস্তি দিয়ে

বলেছে, 'আমার জীবনের বৃহত্তর অংশ বৃটিশ সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় ব্যয় হয়েছে। আমি জিহাদের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজদের আনুগত্যের পক্ষে এতবেশী বই-পত্র লিখি ও ইশতেহার প্রচার করি, যদি সেগুলো একত্রিত করা হয়, তাহলে ৫০টি আলমারি তা দ্বারা পূর্ণ করা যাবে। এ বইগুলো আমি সমস্ত আরব দেশ, মিসর, সিরিয়া, কাবুল ও রোম পর্যন্ত পৌঁছে দেই।' (তিরয়াকুল কুলূব-১৫ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের রক্তে যাদের হাত রঞ্জিত এবং ইসলামের অগণিত আলিম-উলামা এবং স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদেরকে যে ইংরেজরা গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছে, সেসব লাশ দাফন করতে না দিয়ে দিনের পর সেভাবেই ঝুলিয়ে রেখেছে, সেই ইংরেজদের গোলামীর চরম প্ররাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গোলাম লিখেছে–

میں ابتدائی عمر سے اس وقت تك جوقریبًا ساٹھ برس کی عمر تك پہنچا ھوں اپنی زبان اور قلم سے اس اهم کام میں مشغول ھوںا تا کہ مسلمانوں کےدلوں کوگر نمنٹ انگلشیہ کی سچّی محبت اور خیر خواهی اور همدردی کی طرف پھیراوں اور ان کے بعض کم فھموںکے دلوں سے غلط خیال جھاد و غیرہ کو دُور کروں جو ان کو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے هیں،

জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে আজ প্রায় ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কলম ও জিহ্বাকে আমি নিয়োজিত রেখেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে। সেটা হল বৃটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতি, শুভেচ্ছা এবং সত্যিকারের ভালবাসা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের অন্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে কম মেধাসম্পন্ন লোকদের হৃদয় থেকে জিহাদের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করা, যা তাদেরকে আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম সম্পর্কের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। **আমি বিশ্বাস করি আমার অনুসারীদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই জিহাদী চেতনায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। কেননা আমাকে মাসীহ ও মাহদী হিসাবে গ্রহণ করা মানেই জিহাদী উদ্দীপনাকে প্রত্যাখ্যান করা।'** (শাহাদাতুল কোরআন- ১০-১৭পৃষ্ঠা)।

খৃস্টান বা ইংরেজ শক্তির বন্ধুরূপে জিহাদের বিপরীতে দীর্ঘদিন শ্রমদানকারী এই কাদিয়ানীদের আক্বীদা বা কার্যাবলী এদেরকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড় করেছে এবং এরা কাফির শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে। সুতরাং এ

কথা তরলের মতো সহজ হয়ে গেছে যে, মুসলমান বা কোরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে অবস্থানরত কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিঃসন্দেহে এরা অভিশক্ত এবং শয়তানের অনুচর।

ইংরেজদের গোলামী ও কাদিয়ানী গোষ্ঠী

মির্জা গোলাম আহমাদ ইংরেজ প্রীতিতে গদগদ হয়ে লিখেছে-

بلکه اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں که اگر ہم
یہاں سے نکل جائی تونه ہمارا مکّه میں گزارا ہو سکتاہے
اور نه قسطنطیه میں-توپھر کس طرح ہو سکتاہے که ہم
اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میی رکھیں-

প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি এই সরকারের অনেক বেশী অনুকম্পা রয়েছে। কারণ, এখান থেকে আমরা যদি বাইরে কোথাও যাই তবে আমাদের স্থান না মক্কায় হবে না কনস্ট্যান্টিনোপলে। এ অবস্থায় আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিরূপ ধারণা কিভাবে পোষণ করবো, এমন করা কিভাবে সম্ভব। (মলফুজাতে আহমাদীয়া, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

যে মুহূর্তে ভারত বর্ষের মুসলমানরা কলিজার রক্ত ঢেলে দিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আন্দোলন করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে মির্জা গোলাম আহমাদ বৃটিশ সরকারের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে কিভাবে দোয়া করেছেন দেখুন-

میں اپنے کام کو نه مکه میں اچھی طرح چلاسکتاهوں نه
مدینه میں نه روم میں نه شام میں نه ایران میں نه کابل
میں مگراس گورنمنٹ ہیں‌جس کے اقبال کے لیے دعاکرتاهوں،

আমি আমার কাজ না মক্কায় ভালোভাবে চালাতে পারি, না মদীনায়, না রোমে, না সিরিয়ায়, না ইরানে, না কাবুলে, কিন্তু এই সরকারের এলাকার মধ্যেই তা চলতে পারে, যে সরকারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমি দোয়া করছি। (তাবলীগে রিসালাত, ৬ খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

স্বাধীন বাংলার শেষ নবাবকে হত্যা করে যারা ২০০ বছরের জন্য ভারত বর্ষের মুসলমানদের স্বাধীনতা হরণ করেছিল, সেই ঘৃণ্য ইংরেজদের রাজত্বকে মির্জা গোলাম আহমাদ খোদার নেয়ামত বলে গণ্য করে নিজের কাফির অনুসারীদেরকে উপদেশ দিয়ে লিখেছে-

یہ توسوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سائے سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانا کہاں ہے-ایسی سلطنت کا بھلا نام تولوجوتمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی-ہرایك اسلامی سلطنت تمہیں قتل کرنے کے لیے دانت پیس رہی ہے-کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھیر چکے ہو-سو تم اس خداداد نعمت کی قدرکرو اور تم یقیناً سمجھ لوکہ خداتعالیٰ نے سلطنت انگریز میں تمہاری بھلائی کےلیے ہی اس ملك میں قائم کی ہیے اور اگر اس سلطنت پر کوئی آفت آئے تووہ آفت تمہیں بھی نابود کردے گی-اورکسی اور سلطنت کے زیرسایہ رہ کر دیکھ لوکہ تم سےکیاسلوك کیاجاتا ہے-سنو،انگریزی سلطنت تمہارے لیے ایك رحمت ہے، تمہارے لیے ایك برکت ہے، اور خدا کی طرف سے تمہاری وہ سپرہے-پس تم دل وجان سے اس سپر کی قدرکرو-اور ہمارے مخالف جو مسلمان ہیں ہزاروں درجہ اُن سے انگریز بہتر ہیں کیونکہ وہ ہمیں واجب القتل نہیں سمجھتے-وہ تمہیں بے عزّت نہیں کرناچاہتی-

একটু ভেবে দেখো তোমরা যদি এই সরকারের আশ্রয় থেকে বাইরে চলে যাও, তবে তোমাদের স্থান কোথায় হতে পারে? এমন একটি রাষ্ট্রের নাম বলো, যারা তোমাদেরকে আশ্রয় দিবে। প্রত্যেকটি ইসলামী রাষ্ট্রই তোমাদের হত্যার জন্য দাঁত বের করে রয়েছে। কেননা তাদের মতে তোমরা কাফির এবং মুরতাদ। অতএব খোদা প্রদত্ত এই নেয়ামতের যত্ন করো এবং তোমরা নিশ্চিতভাবে এ কথা বুঝে নাও যে, খোদা তা'য়ালা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এদেশে ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যদি এই সরকারের ওপরে কোনো বিপদ দেখা দেয় তবে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে। তোমরা একটু অন্য কোন রাজ্যে গিয়ে কিছুদিন সেখানে বসবাস করে দেখো যে, তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হয়? শুনো! ইংরেজদের রাজত্ব তোমাদের জন্য একটি বরকত এবং খোদার পক্ষ থেকে তা তোমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমরা নিজেদের জান প্রাণ দিয়ে ঢালের যত্ন

করো, হেফাজত করো, সম্মান করো। এবং আমাদের বিরোধী মুসলমানদের তুলনায় তারা অধিক শ্রেষ্ঠ। কারণ তারা আমাদেরকে হত্যার যোগ্য মনে করে না। তারা তোমাদেরকে অপদস্ত করতে চায় না। (তাবলীগে রেসালাত, ২য় খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)

অগণিত আলিম-উলামা এবং পীর-মাশায়েখ হত্যাকারী ইংরেজদেরকে কাদিয়ানীরা নিজেদের জন্য খোদার রহমতের ছায়া হিসেবে উল্লেখ করে পত্রিকায় লিখেছে–

ایرانی گورنمنٹ نے جوسلوك مرزا علی محمد باب بانی فرقه باهایه اور اس کے بیکس مریدوں کےساته محض مذهبی اختلاف کی وجه سے کیا اور جو ستم اس فرقے پر توڑے گئے وہ ان دانش مندلوگوں پر مخفی نهیی هیی جوقوموں کی تاریخ پڑھنے کے عادی هیں-اور پهر سلطنت ٹرکی نےجوایك یورپ کی سلطنت کهلاتی ہے برتا ؤبهاء اللّٰه بانی فرقه باهایه اور اس کے جلا وطن شده پیرووسے ۱۸٦۳ سے لے کر ۱۸۹۳ تك پهلے قسطنطنیه پهر ایڑ ریانوپل اور بعد ازاں مکه کے جیل خا نے میی کیا وہ بهی دنیا کے اهم داقعات پر اطّلاع رکهنے دالوں پر پوشیده نهیں هے، دنیامیی همس بڑی سلطنتیں کهلاتی هیی..................لهزا تمام سچے احمدی جو حضرت مرزا صاحب کو مامور من اللّٰه اور ایك مقدس انسان تصوّر کر تے هیں بغیر کسی خوشامد اور چاپلوسیی کےدل سے یقین کرتے هیں که برٹش گورنمنٹ ان کےلیے فضل ایزدی اور سایئه رحمت ہے اور اس کي هستی کوده اپنی هستی خیال کرتے هیں-

ইরান সরকার বাবিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা আলী মোহাম্মাদ বাব এবং তার অসহায় অনুসারীদের সাথে ধর্মীয় মতবিরোধের কারণে যে ব্যবহার করেছে এবং এই সম্প্রদায়ের ওপরে যে অনাচার অত্যাচার করেছে তা সেসব জ্ঞানী লোকদের অজানা নেই, যারা জাতিসমূহের ইতিহাস পাঠে অভ্যস্ত। তাছাড়া তুর্কি রাজ্য, যা

ইউরোপের একটি রাজ্য নামে পরিচিত, বাহাই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বাহাউল্লা এবং তার নির্বাসিত অনুগামীদের সাথে ১৮৬৩ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত প্রথমে কুস্তুনতুনিয়ায় পরে আদ্রিয়ানোপলে এবং সর্বশেষে আক্কা জেলখানায় যে ব্যবহার করেছে তা দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে যারা খোঁজ রাখেন তাদের কাছে অজানা নয়। দুনিয়ার বুকে তিনটি বড় রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত তিনটি রাষ্ট্রই সংকীর্ণতা এবং বিদ্বেষভাবের যে নমুনা বর্তমান সভ্যতার যুগে প্রদর্শন করেছে, তা আহমাদি জাতিকে নিশ্চিতভাবে এ কথা না বুঝিয়ে পারেনি যে, আহমাদিয়াদের স্বাধীনতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং যেসব নিষ্ঠাবান আহমাদি হযরত মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী সাহেবকে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং একজন পবিত্র মহাপুরুষ হিসেবে মনে করে, অকুণ্ঠিতভাবে এবং শঠতা ব্যতীত তারা বিশ্বাস করে যে, বৃটিশ সরকার তাদের জন্য খোদার রহমতের ছায়া। সুতরাং বৃটিশ সরকারের অস্তিত্বকে তারা নিজেদের সত্ত্বা বলে গণ্য করে, বিশ্বাস করে। (আল ফজল পত্রিকা, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৪)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি স্পষ্টভাষায় এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, মুসলমানদের জন্য যা চরম বিপদ, তাই নবুয়্যাতের দাবীদার এবং তাদের ভক্ত অনুরক্তদের জন্য সঠিক রহমত ও খোদার মেহেরবানী বলে বিবেচিত হয়। কারণ তারা ইংরেজদের ছায়াতলে থেকে মুসলমানদের মধ্যে নিত্য-নতুন নবুয়্যাতের আপদ এবং বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নিরংকুশ স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র মুসলমানদের কাছে যা আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ রহমত, কাদিয়ানীদের কাছে তাই মহাবিপদ। কেননা, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো মুসলমান সমাজ কোনো অবস্থায় আল্লাহ, রাসূল, কোরআন তথা ইসলামের অবমাননা অথবা সমাজ সংস্থাকে শতধাছিন্ন করার অপচেষ্টা সহ্য করতে পারে না।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি কাদিয়ানীদের অপবাদ

নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ছিলেন মহান আল্লাহর একজন সম্মানীত নবী-রাসূল এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে আপন কুদরতে পিতা ব্যতীতই মাতৃগর্ভে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁকে বিশেষ ব্যবস্থায় পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কিয়ামতের পূর্বে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়ে আগমন করবেন। অথচ মহান আল্লাহর একজন সম্মানিত, পূত ও পবিত্র নবী-রাসূল সম্পর্কে কাদিয়ানীদের নেতা অভিশপ্ত গোলাম আহমাদ তাঁর সম্পর্কে কি জঘন্য মন্তব্য করেছে দেখুন, 'আমার তুলনায় ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা নগণ্য। ঈসা (আঃ) মদ পান করতেন, তাঁর বংশধারা ছিল অপবিত্র। কারণ তাঁর তিনজন দাদী ও নানী ছিল যেনাকারিণী। বেশ্যাবৃত্তি করে তারা অর্থোপার্জন করতো। এ কারণে তিনিও বেশ্যাদের সাথে সময় অতিবাহিত করতেন এবং তাদেরকে ভোগ করতেন। তিনি বেশ্যাদের সেবা গ্রহণ করতেন, দুশ্চরিত্রা নারীরা তাঁর মাথায় তেল দিয়ে ও শরীরে আতর মেখে দিতো। কথায় কথায় তিনি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন। মিথ্যা কথা বলতেন, অধিক যেনা করার কারণে তাঁর পুরুষত্ব হ্রাস পেয়েছিল, ফলে তিনি স্ত্রীদের জৈবিক কামনা পূরণে ছিলেন অক্ষম। তার অভ্যাসই ছিল, আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত থাকা, তিনি ছিলেন আল্লাহর ইবাদাত বিমুখ খোদায়ী দাবীদার এক ব্যক্তি। এই লোকটি ছিল দুর্বল এবং তার মধ্যে জন্মের উৎস থেকেই অপবিত্রতা মিশ্রিত ছিল। (হাকীকাতুল ওহী, ১৪৮ পৃষ্ঠা, কিশতিয়ে নূহ, ৬৫ পৃষ্ঠা, সিত বচন, ১৭২ পৃষ্ঠা, রিভিউ অব রিলিজিয়ানস, প্রথম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা, নাসীমে দাওয়াত, ৬৭ পৃষ্ঠা, আনজামে আতহাম-এর পরিশিষ্ট, ৫ ও ৭ পৃষ্ঠা, নূরুল কোরআন, ২ য় খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, নূরুল কোরআন, সংখ্যা ২, ৯ ও ৪৫ পৃষ্ঠা, বারাহীনে আহমাদিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা কাফির

নবুয়্যাত দাবীর স্বাভাবিক পরিণতি এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি নবীর প্রতি ঈমান না আনে, তবে সে ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হতে বাধ্য। সুতরাং কাদিয়ানীরা তাই করেছে। যে সমস্ত মুসলমান মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী বলে স্বীকৃতি দেয়নি, তাদেরকে তারা প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনীর মাধ্যমে কাফির হিসেবে ঘোষণা করেছে। তারা লিখেছে–

کل مسلمان جو حضرت مسیح موعودکی بعیت میں شامل نہیں ہو ئے، خواہ انہوں نےحضرت مسیح موعود کانام بھی سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں-

যে সকল মুসলমান হযরত মসীহে মওউদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেনি এমন কি যারা হযরত মসীহে মওউদের নাম পর্যন্ত শুনেনি তারাও কাফির, ইসলামের বাইরে। (মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমাদ প্রণীত আইনায়ে সাদাকাত, ৩৫ পৃষ্ঠা)

সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে এই অভিশপ্ত কাদিয়ানী গোষ্ঠী কাফির বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। তারা লিখেছে–

ہرایك ایسا شخص جو موسی کومانتاہے مگرعیسی کو نہی مانتا یا عیسی کومانتا ھے مگر محمد کونہی مانتا، یامحمد کو مانتا ھے مگر مسیح موعود کو نہی مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکّا کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ہیں-

যে ব্যক্তি মূসাকে স্বীকার করে অথচ ঈসাকে স্বীকার করে না, অথবা ঈসাকে স্বীকার করে কিন্তু মুহাম্মাদকে স্বীকার করে না, কিংবা মুহাম্মাদকে স্বীকার করে কিন্তু মসীহে মওউদকে স্বীকার করে না, সে ব্যক্তি শুধু কাফির নয় বরং পরিপূর্ণ কাফির এবং ইসলামের গন্ডী বহির্ভূত। (কালেমাতুল ফযল, রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ১১০ পৃষ্ঠা)

পৃথিবীতে যারা কাদিয়ানী নয়, তারা কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে কোনোক্রমেই মুসলমান হতে পারে না। তারা লিখেছে–

ہم چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیر احمدی آپ کونبی نہی مانتے اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کہ کسی نبی کاانکار بھی کفر ہیں غیر احمدی کافر ہیں-

আমরা যেহেতু মির্জা সাহেবকে নবী হিসেবে স্বীকার করি এবং যারা কাদিয়ানী নয় তারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে না, এই কারণেই কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী একজন নবীকেও অস্বীকার করা যদি কুফরী হয়, তবে যারা আহমাদী নয় তারাও কাফির। (গুরুদাসপুর সাব জজের এজলাসে মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমাদ কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি ঃ ২৬-২৯শে জুন ১৯২২ প্রকাশিত আল ফযল পত্রিকা দ্রষ্টব্য)

অভিশপ্ত কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমান নারী-পুরষদের অশালীন ভাষায় গালি দিয়ে লিখেছে–যে ব্যক্তি মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর আনুগত্য করবে না, তার কাছে বাইয়াত হবে না বরং বিরোধিতা করবে, সে খোদা ও রাসূলের অমান্যকারী এবং জাহান্নামী। যারা তাকে মানে না, অস্বীকার করে তারা বনের শূকর এবং তাদের স্ত্রীরা কুকুরীর অধম। (নজমূল হুদা, তাবলীগে রিসালাত, ৯ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের পেছনে নামায আদায় করা নিষেধ

কাদিয়ানীরা মুসলমানদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের সমাজ-সংগঠনে কাজ করে যাচ্ছে। তারা লিখেছে–

حضرت مسیح موعود علیہ السّلام نے سختی سے تاکید فرماتیٔ ہے کہ کسی احمدی کوغیر احمدی کے پسچھے نماز نہی پڑھنی چاہیے-باہرسے لوگ اس کے متعلق باربار پوچھتے ہیں-میں کہتاھوں تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ بھی میں یہی جواب دوں‌گا........کہ غیر احمدی کے پسچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، جائز نہیں،جائز نہیں،

হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন যেন কোনো আহমাদী অন্যের পিছনে নামায না পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু লোক বার বার এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে। আমি বলছি, তোমরা যতবার জিজ্ঞাসা করবে ততবার আমি এই উত্তর দিব যে, অ-কাদিয়ানীদের পিছনে নামায পড়া জায়েয নেই, জায়েয নেই, জায়েয নেই। (আনওয়ারে খেলাফত-৮৯ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের পিছনে নামায আদায় না করার ব্যাপারে তারা আরো লিখেছে–

ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کومسلمان نہ سمجھیی اور ان کے پچھیے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیك وہ خدا تعالےٰ کے ایك نبی کے منکر ہیں-

অ-কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান মনে না করাই আমাদের উচিত। তাদের পিছনে নামায পড়াও আমাদের উচিত নয়। কারণ তারা খোদা তা'য়ালার একজন নবীকে অস্বীকার করে। (আনওয়ারে খেলাফত, ৯০ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে মুসলমান শিশুরাও কাফির-জানাযা পড়া যাবে না

মুসলমানদেরকে কাদিয়ানীরা কাফির মনে করে। এ কারণে কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তারা জানাযায় অংশগ্রহণ করে না। পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান ছিলেন কাদিয়ানী। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ তথা কায়েদে আযম ইন্তেকাল করলে তিনি মৃতদেহের পাশে ছিলেন, কিন্তু জানাযায় অংশগ্রহণ করেননি। কাদিয়ানীরা লিখেছে–

اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کاجنازہ کیوں نہ پڑھا جائے، وہ تو مسیح موعودکا منکر نہیں؟ میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندو اور عیسائیوں کے بچوں کاجنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ غیراحمدی کابچہ بھی غیراحمدی ہوا، اس لیے اس کاجنازہ بھی نہی پڑھنا چاہئے-

কাদিয়ানী নয় এমন কোনো ছোট শিশু-সন্তান মারা গেলে তার জানাযার নামায কেনো পড়া হবে না? কারণ শিশুটি তো আর মসীহে মওউদকে অস্বীকার করে না। আমি এই প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, যদি এ কথা সত্যই হবে, তাহলে হিন্দু এবং খৃষ্টান শিশুদের জানাযা পড়া হয় না কেনো? অ-কাদিয়ানীদের সন্তানও অ-কাদিয়ানীই পরিগণিত হবে। এই কারণে তাদের জানাযা পড়া উচিত নয়। (আনওয়ারে খেলাফত, ৯৩ পৃষ্ঠা)

যারা গোলাম আহমাদকে নবী বলে স্বীকার করে না, তারা কাফির এবং তাদের জানাযা পড়া যাবে না। স্বয়ং গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তার বড় পুত্র মৃত্যুবরণ করলে পুত্রের জানাযায় তিনি অংশগ্রহণ করেননি। কারণ তার পুত্র তাকে নবী হিসেবে স্বীকার করতো না। (আল ফযল, ৯ খন্ড, সংখ্যা ৪৭, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯২১)

যারা কাদিয়ানী নয়, তাদের কাফির হওয়ার বিষয়টি দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কাফিরদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয নেই। (আল ফযল, ৮ খন্ড, সংখ্যা ৭৯, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে পার্থক্য নেই

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খৃষ্টানদের সাথে যেমন ব্যবহার করতেন, হযরত মসীহে মওউদ অ-কাদিয়ানীদের সাথে ঠিক সেই নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করতেন। অ-কাদিয়ানীদের সাথে আমাদের নামায পৃথক করা হয়েছে। তাদেরকে আমাদের কন্যা দান হারাম করা হয়েছে। তাদের জানাযা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এখন আর অবশিষ্ট থাকলো কি? যে বিষয়ে আমরা তাদের সাথে একত্রে থাকতে পারবো? পারস্পরিক যোগাযোগ দু'প্রকারের। একটি ধর্মীয় আর অপরটি পার্থিব। ধর্মীয় যোগাযোগ স্থাপনের মূলসূত্র হলো ইবাদতের ঐক্য। আর পার্থিব সম্পর্কের বুনিয়াদ হলো আত্মীয়তা স্থাপন। কিন্তু এই উভয় প্রকারের সম্পর্ক আমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। যদি বলো যে, তাদের কন্যা গ্রহণের অনুমতি তোমাকে দেয়া হলো কেনো? তার উত্তর হলো, হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীকেও সালামের জবাব দিয়েছেন। (কালেমাতুল ফযল, রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ১৬৯ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সাথে বিয়ে হারাম

কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমানদেরকে অমুসলিম কাফির মনে করে বিধায় তারা তাদের মেয়েকে কোনো মুসলমানের সাথে বিয়ে দেয়া হারাম মনে করে। তাদের নিজেদের একটি ঘটনা সম্পর্কে তারা লিখেছে-

حضرت مسیح موعود نے اُس احمدی پرناراضگی کا اظہارکیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کودی، آپ سے ایك شخص نے باربار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کویہی فرمایا کہ لڑکی کوبٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو،آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دےدی تو حضرت خلیفۃ اوّل نے اس کواحمدیوں کی امامت سے ہٹادیا اور جماعت سے خارج کردیا اور اپنی خلافت کےچھ سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی باوجود یکہ وہ باربار توبہ کرتا رہا-

যে কোনো আহমাদী নিজের মেয়েকে অ-কাদিয়ানীর সাথে বিয়ে দিবে তার সম্পর্কে হযরত মসীহে মওউদ অত্যন্ত রুষ্টভাব প্রকাশ করেছেন। এক ব্যক্তি তার কাছে বার বার একথা জিজ্ঞেস করলো এবং বিভিন্ন অসুবিধার কথা জানলো। কিন্তু তিনি সেই লোকটিকে বললেন যে, মেয়েকে অবিবাহিত রাখো, তবুও অ-কাদিয়ানীর সাথে বিয়ে দিও না। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মৃত্যুর পরে সেই লোকটি নিজের মেয়েকে অ-কাদিয়ানীর সাথে বিয়ে দিলে প্রথম খলিফা তাকে ইমামের পদ থেকে অপসারণ করেন, তাকে আহমাদী জামায়াত থেকে বহিষ্কার করেন; এবং তার খেলাফতের ৬ বছর সময়ের মধ্যে লোকটির তওবা পর্যন্ত কবুল করেননি; যদিও লোকটি বার বার তওবা করেছিল। (আনওয়ারে খেলাফত, ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

যারা কাদিয়ানী নয় তাদের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেবে না। দিলে গোনাহ্গার হবে। তবে তাদের মেয়েকে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই। (আল হাকাম, ১৪ এপ্রিল সংখ্যা, ১৯০৮)

কাদিয়ানীদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৯৩১ সালের ৩০শে জুলাই আল ফজল পত্রিকায় কাদিয়ানী খলিফার অন্য একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, গোলাম আহমাদের জীবদ্দশায় কাদিয়ানীদের জন্য পৃথক একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পর্কে যে আলোচনা চলছিল তার উল্লেখ রয়েছে। তখন এই প্রশ্ন নিয়ে কাদিয়ানীদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। একদল কাদিয়ানীর মতে পৃথক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তারা বলতো যে, আমাদের সাথে সাধারণ মুসলমানদের পার্থক্য মাত্র কয়েকটি বিষয়ে, কিন্তু হযরত মসীহে মওউদ আলাইহিস সালাম তার সমাধান করেছেন। তিনি সে সকল বিষয়ে প্রমাণাদি বলে দিয়েছেন। অন্যসব বিষয়ে সাধারণ মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষা লাভ করা যায়।

কাদিয়ানীদের একটি দল এই মতের বিরোধিতা করছিল। ইতোমধ্যে মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সব কথা শুনার পরে নিজের রায় দিলেন। উক্ত রায় সম্পর্কে খলিফা সাহেব উল্লেখ করেছেন, একথা ভুল যে, অন্যান্যদের সাথে আমাদের বিরোধ শুধু ওফাতে মসীহ অথবা মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কোরআন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি মোটকথা তিনি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের (মুসলমানদের) সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের বিরোধ রয়েছে।

মাওঃ শাহ্ আতাআল্লাহ্ বোখারীর সাথে কাদিয়ানী নেতার কথোপকথন

এই ঘৃণ্য ব্যক্তির সাথে একবার মাওলানা শাহ্ আতাআল্লাহ্ বোখারী (রাহঃ)-এর বিতর্ক হয়েছিলো। শাহ্ আতাআল্লাহ (রাহঃ) মির্জা গোলাম আহমাদকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি নিজেকে যে নবী বলে দাবী করছো, এই সাহস তুমি কোথায় পাচ্ছো?

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ঐ অভিশপ্ত লোকটিকে তিনি একথা বলেননি যে, তুমি যে নবী তার প্রমাণ কি? কারণ ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যে ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করবে, তার কাছে তার নবুয়্যাতের প্রমাণ চাওয়াও জায়েয নেই। কারণ আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করেছেন, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। প্রমাণ চাওয়ার অর্থই হলো, রাসূলের কথার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা এবং এ কথা প্রতিষ্ঠিত করা যে, প্রমাণ দিতে পারলে তাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এ জন্য শাহ্ আতাআল্লাহ বোখারী (রাহঃ) প্রমাণ দাবী না করে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি নবুয়্যাত দাবী করার সাহস কোথায় পাচ্ছো। গোলাম আহমাদ জবাবে কোরআনের সূরা আস-সাফ-এর ৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিল– يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ– আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহ্মাদ।

অর্থাৎ আমার কথা তো কোরআনেই বলা হয়েছে যে, তোমার (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পরে যিনি নবী হিসেবে আগমন করবেন, তার নাম হবে আহমাদ।

মাওলানা শাহ্ আতাআল্লাহ বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা একথা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে বলেছিলেন যে, তোমার পরে যিনি নবী-রাসূল হিসেবে আগমন করবেন, তাঁর নাম হবে আহমাদ। তিনি তাঁর জাতিকে এ সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা এভাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗ اَحْمَدُ-

এবং স্মরণ করো মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা, যা সে বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, সত্যতা বিধানকারী সেই তওরাতের যা আমার পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাসূলের যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহ্‌মাদ। (সূরা সাফ-৬)

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর জাতিকে শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে বলেছিলেন। কিন্তু তুমি তো গোলাম আহমাদ। অর্থাৎ শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি নাম আহ্‌মাদ। তুমি হলে সেই আহমাদের গোলাম।

অভিশপ্ত লোকটি কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে বললো, আমার নাম গোলাম আহমাদ। নামের প্রথম অংশ ছেড়ে দিলে আমিই তো আহমাদ হই।

মাওলানা বললেন, তোমার যুক্তি অনুসারেই তোমাকে বলছি, আমার নাম হলো আতাআল্লাহ্। আমার নামের প্রথম অংশ আতা ছেড়ে দিলে অবশিষ্ট থাকে আল্লাহ। আমি তোমার যুক্তি অনুসারে সেই ভিত্তিতেই বলছি, তোমার মতো অভিশপ্ত গাধাকে আমি নবী হিসেবে প্রেরণ করিনি।

পরবর্তীতে অভিশপ্ত মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয় এবং মল ত্যাগের সময় মলমূত্রের কূপে পড়ে গিয়ে মলমূত্র গলধকরণ করে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যায়। পায়খানায় পড়ে যাবার বিষয়টি তার অনুসারীরা তৎক্ষণাত জানতে পারেনি। ফলে তার অনুসারীরা নিজেদের নবীর অনুসন্ধান করতে থাকে। তিনদিন পর তাকে দুর্গন্ধময় পায়খানার মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এভাবেই অপমানের সাথে মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী লা'নাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে জাহান্নামে পৌঁছে যায়।

কাদিয়ানী রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যাশা

'বৃটিশের জুলুমশাহীকে খোদার রহমত এবং মুসলমানদের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহকে আপদ মনে করেই কাদিয়ানীরা বিরত থাকেনি। বরং তাদের মধ্যে পাকিস্তানের কোনো এলাকায় একটি কাদিয়ানী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের তীব্র আকাঙ্খা দেখা দিয়েছে। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাত্র এক বছর পর ১৯৪৮ সালের ২৩শে জুলাই কাদিয়ানীদের মুখপত্র আল ফজল পত্রিকার ১৩ই আগস্ট সংখ্যায় লেখা হয়েছে, বৃটিশ-বেলুচিস্তান এখন যা পাক-বেলুচিস্তান নামে পরিচিত, এখানের লোকসংখ্যা মাত্র পাঁচ লক্ষ। যদিও এর জনসংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক কম, তথাপি একটি ইউনিট হিসেবে এর গুরুত্ব অনেক। পৃথিবীতে যেমন মানুষের মর্যাদা, তেমনি মর্যাদা ইউনিটেরও। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে সিনেট সভার সদস্যগণ স্টেটের জনসংখ্যা ১০ কোটি-না, এক কোটি। সকল স্টেটের পক্ষ হতে সমান সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করা হয়। মোটকথা পাক-বেলুচিস্তানের জনসংখ্যা মাত্র ৫/৬ লক্ষ। এই সংগে যদি বেলুচিস্তানের দেশীয় রাজ্যগুলোও ধরা হয়; তবে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১১ লক্ষ। কিন্তু যেহেতু এটা একটি ইউনিট, এই কারণে তার গুরুত্ব অনেক। জনসাধারণের অধিকাংশকে আহমাদি মতে দীক্ষিত করা কঠিন; কিন্তু অল্পসংখ্যক লোককে আহমাদি মতে দীক্ষিত করা তেমন কঠিন নয়। সুতরাং আহমাদি জামায়াত যদি এই বিষয়ের প্রতি পূর্ণরূপে গুরুত্বারোপ করে, তবে এই প্রদেশটিকে অতি শীঘ্রই কাদিয়ানী বানানো সম্ভব হবে। তোমরা একথা স্মরণে রেখো যে, আমাদের ঘাঁটি বা ভিত্তিমূল মজবুত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রচার সফল হতে পারে না। প্রথমে যদি ভিত্তিমূল বা ঘাঁটি মজবুত হয়, তবেই প্রচার-প্রসার লাভ করে। এখন তোমরা নিজেদের ঘাঁটি নির্মাণ করো, যে কোনো দেশে হোক না কেনো। আমরা যদি গোটা প্রদেশটিকে আহমাদি বানাতে পারি, তাহলে অন্তত একটি প্রদেশতো এমন হবে যাকে আমরা নিজেদের প্রদেশ বলে ঘোষণা করতে পারবো। আর এই কাজ অতি সহজেই হতে পারে।'

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের প্রধান কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে কাদিয়ানীরা পাকিস্তানকে কাদিয়ানী রাষ্ট্রে পরিণত করার যে নীল নকশা প্রণয়ন করেছিল, উলামায়ে হক্কানীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের কারণে তা ভন্ডুল হয়ে যায়।

কাদিয়ানীদের বক্তৃতা, বিবৃতি, কার্যাবলী ও গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিতে গেলে বিশাল আকারের এক গ্রন্থ রচিত হবে। আমি তাদের গ্রন্থ থেকে যেসব উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি, তা পাঠ করলে ইসলাম সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির কাছেও একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয় এবং কেনো তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। এখন আমি খাত্‌মে নবুয়্যাত ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কোরআন-হাদীসের আলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। আশা করি এই আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কাদিয়ানীবাদ মুসলিম নামধারী একটি কাফির সম্প্রদায়ের নাম। শুধু তাই নয়, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে একটি অঘোষিত চ্যালেঞ্জ। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে একটি দুষ্টক্ষত, এক মহামারী, ইসলাম ও নবীদ্রোহী অপশক্তি। তাই তাদের মরণ ছোবল থেকে ভাবী প্রজন্মকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এবং মুসলিম মিল্লাতের ঈমান রক্ষার্থে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গীন জিহাদে শরীক হওয়া ঈমানদীপ্ত প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। কাদিয়ানীরা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছে এবং যারা তাদের সমর্থনে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছে বা তাদের পক্ষাবলম্বন করেছে, তারা মুসলমান হিসেবে নিজেদেরকে দাবী করতে পারে কি না– এই আলোচনা থেকে এ কথাও স্পষ্ট প্রতিভাত হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

বিশ্বনবীই খাতিমুন নাবিয়্যীন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ-وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا-

(হে লোকেরা !) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নন কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী আর আল্লাহ সব জিনিসেরই জ্ঞান রাখেন। (সূরা আহযাব-৪০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কোরআনুল কারীমের বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন যে, তিনিই কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আমরা এখানে পবিত্র কোরআন থেকে মাত্র দুটো আয়াত উল্লেখ করছি।

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا-

হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। (আল কোরআন)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا-

আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির নিকট সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। (আল কোরআন)

বর্তমান পৃথিবীতে একটি জনগোষ্ঠী যারা কাদিয়ানী নামে পরিচিত, তারা খত্‌মে নবুয়্যাতের বিরুদ্ধে ফেতনা সৃষ্টি করেছে। তারা সূরা আহ্‌যাবের উল্লেখিত আয়াতের 'খাতামান নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ করে থাকে 'নবীদের মোহর'। তারা বুঝাতে চায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তাঁর মোহরাঙ্কিত হয়ে আরো অনেক নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো নবুয়্যাত বিশ্বনবীর মোহরাঙ্কিত না হয় ততক্ষণ তিনি নবী হতে পারবেন না। পক্ষান্তরে উল্লেখিত আয়াতটি যে ঘটনা পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে, তাকে সেই বিশেষ পরিবেশে রেখে বিচার করলে, তা থেকে ঐ অর্থ গ্রহণ করার কোনো সুযোগই অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু যারা উল্লেখিত অর্থ গ্রহণ করেছে, যদি সে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে যে উদ্দেশ্যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এটা কি নিতান্ত অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ের বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট নানা ধরণের সংশয়-সন্দেহের উত্তর দিতে গিয়ে সূরা আহ্‌যাবের যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয় সহসা সে আয়াতের মাঝে বলে দেয়া হলো যে, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন নবীদের মোহর।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে যত নবী আগমন করবেন তারা সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই মোহরাঙ্কিত হবেন।' হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার ঘটনার মাঝখানে এ কথাটির আকস্মিক আগমন শুধু অবান্তরই নয়, এ থেকে উক্ত

বিয়ের প্রতিবাদ কারীদেরকে যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছিলো তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদকারীদের হাতে একটা চমৎকার সুযোগ আসতো এবং তারা সহজেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে পারতো যে, 'আপনি যয়নবকে বিয়ে করে পালক পুত্রের প্রথা রহিত করতে না-ও পারতেন, এ প্রথা রহিত করতে গিয়ে আজ যে অপবাদের মোকাবিলা আপনাকে করতে হচ্ছে, এ থেকে অন্তত নিষ্কৃতি পেতেন। কেননা এই অর্থহীন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রথাটা যদি একান্তই বাতিল করার প্রয়োজন হতো, তাহলে আপনার পরে আপনার মোহরাঙ্কিত হয়ে যেসব নবী আসবেন, তারাই তো এই প্রথাটি বাতিল করতে পারতেন।'

কিন্তু আরবী ভাষার অধিকারী আরববাসী এ ধরণের কোনো প্রশ্ন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উত্থাপন করেনি। 'খাতমুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ যদি বর্তমানে মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদারদের অনুরূপ হতো, তাহলে আরবের লোকজন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তেমন কোনো প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপন করতো। আরবদের তুলনায় বর্তমানের কাদিয়ানী গোষ্ঠী কি আরবী ভাষায় অধিক দক্ষ? এই কাদিয়ানী গোষ্ঠী কোরআনের উক্ত আয়াতের আরেকটি অর্থ করেছে যে, 'খাতামুন নাবিয়্যীন'-এর অর্থ হলো, 'আফজালুন নাবিয়্যীন' অর্থাৎ নবুয়্যাতের দরোজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা নবুয়্যাত পূর্ণতা লাভ করেছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

কিন্তু তাদের এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখিত বিভ্রান্তির পুনরাবির্ভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। মূল ঘটনার অগ্রপশ্চাতের সাথে এ ধরনের কোনো ব্যাখ্যার সাদৃশ্য নেই। বরং তাদের সে ব্যাখ্যা পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থই প্রকাশ করে। তদানীন্তন কালের কাফির ও মুনাফিকরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে পারতো, 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন নবী যখন আপনার পরে আসতেই থাকবে, তখন এ পালক পুত্র রহিতকরণের কাজটা তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন, এই প্রথার ইতি যে আপনাকেই ঘটাতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা তো নেই।'

আভিধানিক অর্থে খাতামুন শব্দ

আরবী ভাষায় এই শব্দটি খাতাম-ও হয় আবার খাতিম-ও হতে পারে। এ শব্দটি ক্রিয়াবাচক হতে পারে আবার শেষ অর্থে নাম ও পদ-ও হতে পারে। যা দিয়ে শেষ করা হয় এ শব্দটি সে অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ এই শব্দ ব্যবহার করে নবুয়্যাতের দ্বার চিরতরে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন পত্র লেখা শেষ করে খাম বন্ধ করার পর পত্রের ওপরে গালা লাগিয়ে সীল মেরে পত্রের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, যেন যার উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করা হলো, সেই প্রাপক ব্যতীত অন্য কেউ উক্ত পত্র খুলতে সক্ষম না হয়। পক্ষান্তরে সূরা আহ্যাবে ব্যবহৃত খাতাম শব্দটির মাত্র একটি অর্থই হতে পারে। সে অর্থ হলো, নবুয়্যাতের দ্বার কিয়ামত পর্যন্ত রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোনো নবী আগমনের অবকাশ নেই, অবকাশ নেই রিসালাতের। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রচিত কোরআনের অভিধান, তাফসীর ও ইতিহাসের এ বিষয়ে এটাই শেষ কথা। এ সম্পর্কে দুইজন গবেষকও দ্বিমত প্রকাশ করেননি।

যে ঘটনা উপলক্ষে কোরআনের খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দ সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, তার পূর্বাপর ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এখানে খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের অর্থ নবুয়্যাতের ক্রমধারার পরিসমাপ্তি ঘোষণা অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী আসবেন না। কিন্তু শুধু পূর্বাপর সম্পর্কের দিক দিয়েই নয়, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়েও এটিই একমাত্র সত্য। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী 'খতম' শব্দের অর্থ হলো, মোহর লাগানো, বন্ধ করা, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং কোনো কাজ শেষ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করা। যেমন 'খাতামাল আমাল' শব্দের অর্থ হলো, 'ফারাগা মিনাল আমাল' অর্থাৎ কাজ শেষ করে ফেলেছে।

'খাতামাল ইনায়া' শব্দের অর্থ হলো, পত্র বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে আসতে এবং বাইরে থেকে ভেতরে যেতে না পারে। 'খাতামাল আলাল কাল্‌ব' শব্দের অর্থ হলো, দিল বা হৃদয়ের ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। এরপর কোন কথা আর সে

অনুধাবন করতে পারবে না এবং তার ভেতরে জমে থাকা কোনো কথা বাইরে বের হতে পারবে না। 'খিতামু কুল্লি মাশরুব' শব্দের অর্থ হলো, কোন পানীয় পান করার পর শেষে যে স্বাদ অনুভূত হয়।

'খাতিমাতু কুল্লি শাইয়িন আকিবাতুহু ওয়া আখিরাতুহু' বাক্যের অর্থ হলো, প্রত্যেক জিনিসের 'খাতিমা' অর্থ হলো তার পরিণাম এবং শেষ। 'খাতামাশ্ শাইয়্যি বালাগা আখিরাহ' কথার অর্থ হলো, কোনো জিনিসকে খতম করার অর্থ হলো তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। 'খত্মে কোরআন' বলতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং এ অর্থের ভিত্তিতে প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় 'খাওয়াতিম।' খাতামুল কওমে আখেরুহুম-শব্দের অর্থ হলো, খাতামুল কওম অর্থ জাতির শেষ ব্যক্তি। (লিসানুল আরব, কামুস এবং আকরাবুল মাওয়ারিদ)

ঠিক এ কারণেই সমস্ত অভিধান বিশারদ এবং মুফাস্সিরীনে কেরাম 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছেন, আখিরুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খাতাম'–এর অর্থ ডাক ঘরের মোহর নয়, যা চিঠির ওপর লাগিয়ে চিঠি ডাকে দেয়া হয়, বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এ উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে বের হতে পারবে না এবং বাইরের কোন জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে খত্মে নবুয়্যাত অস্বীকারকারীরা বা কাদিয়ানী গোষ্ঠী আল্লাহর দ্বীনের সুরক্ষিত ঘরে ছিদ্র করার জন্য এসব আভিধানিক অর্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলেছে। তারা বলতে চায়, কোনো ব্যক্তিকে 'খাতামুশ শো'য়ারা' 'খাতামুল ফোকাহা' অথবা 'খাতামুল মুফাস্সিরীন' বললে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় না যে, যাকে ঐ পদবী দেয়া হয়, তারপরে আর কোনো কবি, আইনবিদ ও ব্যাখ্যাকারী সৃষ্টি হননি। বরং এর অর্থ এই হয় যে, ঐ ব্যক্তির ওপরে উল্লেখিত বিদ্যা অথবা শিল্পের পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথবা কোনো বস্তুকে অত্যধিক ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ ধরণের পদবী ব্যবহারের ফলে কখনো খতম–এর আভিধানিক অর্থ 'পূর্ণ' অথবা 'শ্রেষ্ঠ' হয় না এবং 'শেষ' অর্থে এর ব্যবহার ক্রটিপূর্ণ বলেও গণ্য হয় না।

একমাত্র ব্যাকরণ-রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এ ধরণের কথা বলতে পারেন। কোন ভাষারই নিয়ম এটা নয় যে, কোনো একটি শব্দ তার আসল অর্থের পরিবর্তে কখনো কখনো দূর সম্পর্কের অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হলে সেটাই তার প্রকৃত অর্থে

পরিণত হবে এবং প্রকৃত আভিধানিক অর্থে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। একজন আরবী ভাষী আরেকজনকে যখন বলবে, 'জাআ খাতামুল কওম' তখন কখনো সে মনে করবে না যে, গোত্রের শ্রেষ্ঠ অথবা কামিল ব্যক্তি এসেছে। বরং সে মনে করবে যে, গোত্রের সবাই এসে গেছে, এমনকি অবশিষ্ট শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্তও এসেছে।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোনো মানুষকে যখন তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ 'খাতামুশ শো'য়ারা', 'খাতামুল ফুকাহা' ও 'খাতামুল মুহাদ্দিসীন' ইত্যাদি উপাধি দান করা হয়, এ ধরণের উপাধি মানুষ কর্তৃকই আরেকজন মানুষকে দেয়া হয়। আর মানুষ যে ব্যক্তিকে কোনো গুণের ক্ষেত্রে 'শেষ' বলে দিচ্ছে তারপরে ঐগুণ সম্পন্ন আর কেউ জন্মাবে কিনা তা সে কখনোই জানতে পারে না। তাই মানুষের কথায় এ ধরণের উপাধির অর্থ নিছক বাড়িয়ে বলা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার স্বীকৃতি ছাড়া আর বেশী কিছু হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা যখন কারো ব্যাপারে বলে দেন যে, অমুক গুণটি অমুক ব্যক্তি পর্যন্ত শেষ হয়েছে তখন তাকে মানুষের কথার মতো উপমা বা রূপক মনে করে নেয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা যদি কাউকে শেষ কবি বলে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিন্তভাবে তারপর আর কোনো কবি হতে পারে না। আর তিনি যাকে শেষনবী বলে দিয়েছেন তাঁর পরে আর কোনো নবী হওয়াই অসম্ভব। কারণ, মহান আল্লাহ হচ্ছেন আলিমুল গায়িব এবং মানুষ আলিমুল গায়িব নয়। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে কাউকে খাতামুন নাবিয়্যীন বলে দেয়া এবং মানুষের পক্ষ থেকে কাউকে খাতামুশ শোয়ারা বা খাতামুল ফুকারা বলে দেয়া কোনোক্রমেই একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না এবং তা কখনোই সম্ভব নয়।

হাদীসের আলোকে খত্মে নবুয়্যাত

খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দটির পূর্বাপর সম্পর্ক এবং আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে যে অর্থ হয়, এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন বক্তব্যও তা সমর্থন করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে হাদীসের বর্ণনাগুলো সামনে রাখা দরকার। স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খত্মে নবুয়্যাত সম্পর্কে বলেন–বনী ইসরাঈলীদের নেতৃত্ব দিতেন আল্লাহর রাসূলগণ। যখন কোনো নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য কোনো নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন (সেই শূন্যতা পূরণ করতেন)। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী হবে না, শুধু খলীফা। (বোখারী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো, এক ব্যক্তি একটি দালান নির্মাণ করলো এবং তা খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সজ্জিত করলো। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইঁটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, এ স্থানে একটি ইঁট রাখা হয়নি কেনো? বস্তুত আমি সেই ইঁট এবং আমিই শেষনবী। (অর্থাৎ আমার আসার পর নবুয়্যাতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন এর মধ্যে এমন কোনো শূন্যস্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য পুনরায় কোনো নবীর প্রয়োজন হবে।) (বোখারী)

এই একই ধরণের বক্তব্য সম্বলিত চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে কিতাবুল ফাযায়েলের বাবু খাতামুন নাবিয়্যানে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং শেষ হাদীসটিতে কিছু অংশ বেশী উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'এরপর আমি এলাম এবং আমি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিলাম।' হাদীসটি তিরমিজী শরীফে একই শব্দসহ কিতাবুল মানাকিবের বাবু ফাদলিন নাবী এবং কিতাবুল আদাবের বাবুল আমসালে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আবু দাউদ তিয়ালাসীতে হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের সিলসিলায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর শেষের অংশ হলো 'আমার মাধ্যমে নবীদের সিলসিলা খতম হলো।'

মুসনাদে আহ্মাদে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যের সাথে একই বক্তব্য সম্বলিত হাদীস হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ছয়টি ব্যাপারে অন্যান্য নবীদের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব

দান করা হয়েছে। (১) আমাকে পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। (২) আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (৪) পৃথিবীর যমীনকে আমার জন্য মসজিদ (অর্থাৎ আমার শরীয়াতে নামাজ কেবল বিশেষ ইবাদাতগাহে নয়, পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে আদায় করা যেতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে (শুধু পানিই নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল অর্থাৎ অজু এবং গোসলের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে) পরিণত করা হয়েছে। (৫) সমগ্র পৃথিবীর জন্য আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে এবং (৬) আমার ওপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রিসালাত এবং নবুয়্যাতের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো রাসূল এবং নবী আসবে না। (তিরমিযী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি মুহাম্মাদ। আমি আহ্মাদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফ্রকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদেরকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকি আছে) আমি সবার শেষে আগমনকারী (এবং সবার শেষে আগমনকারী হলো সেই) যার পরে আর নবী আসবে না। (বোখারী, মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। (কিন্তু তাদের যুগে সে বহির্গত হয়নি) এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মাত। দাজ্জাল নিঃসন্দেহে এখন তোমাদের মধ্যে বহির্গত হবে। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আ'সকে বলতে শুনেছি, একদিন আল্লাহর রাসূল নিজের ঘর থেকে বের হয়ে আমার মধ্যে এলেন। তিনি এভাবে এলেন যেন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মুহাম্মাদ। তারপর বললেন, আমার পর আর কোনো নবী নেই। (মুসনাদে আহমাদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই। আছে সুসংবাদ দানকারী ঘটনাবলী। জানতে চাওয়া হলো, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! সুসংবাদ দানকারী ঘটনাগুলো কি? জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উত্তম স্বপ্ন–কল্যাণময় স্বপ্ন। (অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণ হবার এখন আর কোনো সম্ভাবনা নেই। খুব বেশী একথা বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি কাউকে কোনো ইঙ্গিত দেয়া হয়, তাহলে শুধু ভালো স্বপ্নের মাধ্যমেই তা দেয়া হবে) (মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, আবু দাউদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার পরে যদি কোনো নবী হতো, তাহলে ওমর ইবনে খাত্তাব সে সৌভাগ্য লাভ করতো। (তিরমিযী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বলেন, আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই। (বোখারী, মুসলিম)

বোখারী এবং মুসলিম তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসংগেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহ্‌মাদে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত দুটো হাদীস হযরত সা'দ ইবনে আবি ওযাক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি বর্ণনার শেষাংশ হলো, 'কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই।' আবু দাউদ তিয়ালাসি, ইমাম আহ্‌মাদ এবং মুহাম্মাদ ইসহাক এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে মদীনা নগরীর তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুনাফিকরা বিভিন্ন ধরণের কথা বলতে থাকে। হযরত আলী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে শিশু এবং নারীদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন? আল্লাহর নবী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো।' অর্থাৎ তূর পর্বতে যাবার সময় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যেমন বনী ইসরাঈলীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হযরত হারুনকে রেখে গিয়েছিলেন অনুরূপভাবে মদীনার হেফাজতের জন্য আমি তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে এই সন্দেহও জাগে যে, হযরত হারুনের সাথে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়তো পরে এ থেকে কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং পর মুহূর্তেই তিনি কথাটি স্পষ্ট করে দেন এই বলে যে, আমার পর আর কোনো ব্যক্তি নবী হবে না।

মদীনার হেফাজতের জন্য আমি তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে এই সন্দেহও জাগে যে, হযরত হারুনের সাথে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়তো পরে এ থেকে কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং পর মুহূর্তেই তিনি কথাটি স্পষ্ট করে দেন এই বলে যে, আমার পর আর কোনো ব্যক্তি নবী হবে না।

হযরত সাওবান বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমার পর আর কোনো নবী নেই। (আবু দাউদ)

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আরেকটি হাদীস আবু দাউদ কিতাবুল মালাহেমে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও হযরত সাওবান এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম থেকে এ হাদীস দুটো বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনা হলো–এমন কি ত্রিশ জনের মতো প্রতারক আসবে। তাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে অনেক লোক এমন ছিলেন যে, যাঁদের সাথে কথা বলা হয়েছে, অথচ তাঁরা নবী ছিলেন না। আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ হয়, তাহলে সে হবে ওমর। (বোখারী)

মুসলিমে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে 'ইউকাল্লিমুনা' শব্দের পরিবর্তে 'মুহাদ্দিসুনা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মুকাল্লাম এবং মুহাদ্দাস শব্দ দুটো সমার্থক। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন অথবা যার সাথে পর্দার পেছন থেকে কথা বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, নবুয়্যাত ছাড়াও যদি এই উম্মাতের মধ্যে কেউ আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করতেন তাহলে তিনি একমাত্র হযরত ওমরই হতেন। আল্লাহর রাসূল বলেন, আমার পরে আর কোনো নবী নেই এবং আমার উম্মাতের পর আর কোনো উম্মাত নেই। (বাইহাকী, তাবারাণী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি শেষনবী এবং আমার মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী শেষ মসজিদ)। (মুসলিম)

খত্মে নবুয়্যাত অস্বীকারকারীরা এ হাদীস থেকে প্রমাণ করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ বলেছেন, অথচ এটিই শেষ মসজিদ নয়–এরপরও পৃথিবীতে অগণিত মসজিদ নির্মিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন যে, তিনি শেষনবী। এর অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরেও নবী আসবেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তিনি হলেন শেষনবী এবং তাঁর মসজিদ শেষ মসজিদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের বিকৃত অর্থই এ কথা প্রমাণ করে যে, এ লোকগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টাও করেনি। মুসলিম শরীফের এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো সম্মুখে রাখলেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আল্লাহর রাসূল তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ কোন্ অর্থে বলেছেন।

এখানে হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এবং হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার যে বর্ণনা ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীর মাত্র তিনটি মসজিদ এমন রয়েছে যেগুলো সাধারণ মসজিদগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। সেখানে নামাজ আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায় এবং এ জন্য একমাত্র এ তিনটি মসজিদে নামাজ আদায় করার জন্য ভ্রমণ করা জায়েজ। পৃথিবীর অবশিষ্ট মসজিদগুলোর মধ্যে সমস্ত মসজিদকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে একটি মসজিদে নামাজ আদায় করার জন্য সেদিকে ভ্রমণ করা জায়েজ নয়। এর মধ্যে মসজিদুল হারাম হলো প্রথম মসজিদ। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো মসজিদুল আক্সা, হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং তৃতীয়টি হলো মদীনা নগরীর মসজিদে নববী। এটি নির্মাণ করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলের কথার অর্থ হলো, এখন যেহেতু আমার পর আর কোনো নবী আসবে না, সেহেতু আমার মসজিদের পর পৃথিবীর আর চতুর্থ এমন কোনো মসজিদ নির্মিত হবে না, যেখানে নামাজ আদায় করার সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বেশী হবে এবং সেখানে নামাজ আদায় করার জন্য সেদিকে ভ্রমণ করা জায়েজ হবে।

আল্লাহর নবীর কাছ থেকে বহু সংখ্যক সাহাবী এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভযোগ্য সনদসহ এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট জানা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে এ কথা পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, তিনিই শেষনবী। তাঁর পর কোনো নবী আসবে না। নবুয়্যাতের ক্রমধারা তাঁর ওপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পর যে ব্যক্তি রাসূল অথবা নবী হবার দাবী করবে, সে হবে দাজ্জাল এবং মিথ্যুক। পবিত্র কোরআনের খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? রাসূলের বক্তব্যই এখানে চরম সনদ এবং প্রমাণ। উপরন্তু যখন রাসূলের বক্তব্য কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করে তখন তা আরো অধিক শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক আর কে কোরআন বুঝেছে এবং তাঁর চেয়ে অধিক কোরআনের ব্যাখ্যার অধিকার কোন্ ব্যক্তির রয়েছে? এমন কে আছে যে, খত্মে নবুয়্যাতের অন্য কোনো অর্থ বর্ণনা করবে এবং তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেও ইসলামের অনুসারীরা প্রস্তুত থাকবে?

খত্মে নবুয়্যাতে অবিশ্বাসীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের বিপরীতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বলে কথিত একটি বর্ণনা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। সে বর্ণনা হলো, 'বলো নিশ্চয়ই তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন, এ কথা বলো না যে তাঁর পর নবী নেই।'

এ হাদীসের ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদদের কথা হলো, প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট আদেশকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার উদ্ধৃতি দেয়া একটা চরম ধৃষ্টতা। অধিকন্তু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বলে কথিত হাদীসটি মোটেই হাদীস নয়। এ বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীস শাস্ত্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই হযরত আয়েশার বলে কথিত হাদীসটির কোনো উল্লেখ নেই। কোনো বিখ্যাত হাদীস লিপিবদ্ধকারী হাদীস নামে বর্ণিত সে বর্ণনা উল্লেখ করেননি। হযরত আয়েশার বর্ণনা বলে কথিত বর্ণনাটি শুধু 'দুররি মানসুর' নামক তাফসীরে এবং 'তাকমিলাহ মাজমা-উল-বিহার' নামক অপরিচিত সংকলন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এর উৎপত্তি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনোই ধারণা পাওয়া যায় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট হাদীস যা বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারীরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন অতি সতর্কতার সাথে, তাকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার বলে

কথিত একেবারেই দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীস নামে কথিত বাক্য দিয়ে প্রমাণ পেশ করতে যাওয়া চরমতম ধৃষ্টতা এবং হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার ওপরে মদীনার মুনাফিকদের ন্যায় কলঙ্ক আরোপের শামিল।

শেষনবী প্রসঙ্গে সাহাবীদের ঐকমত্য

কোরআন ও হাদীসের প্রমাণের পর অবশিষ্ট থাকে সকল সাহাবায়ে কেরামের মতামত এবং সাহাবায়ে কেরামের মতামতই হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহাবায়ে কেরামের মতামতের সামনে তাঁদের পরবর্তী কোনো মানুষের মতামতের কানাকড়ি মূল্যও নেই। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যেসব লোক নবুয়্যাতের দাবী করে এবং যারা তাদের নবুয়্যাত স্বীকার করে নেয়, তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মুসাইলামা মিথ্যাবাদীর বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। এই লোকটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যাত অস্বীকার করেনি, বরং সে দাবী করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যাতে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অংশীদার করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পূর্বে এই মিথ্যাবাদী মুসাইলামা আল্লাহর রাসূলের কাছে যে পত্র প্রেরণ করেছিল তাতে সে উল্লেখ করেছিল– আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সমীপে। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুয়্যাতের কার্যক্রমে অংশীদার স্থাপন করা হয়েছে।

এ ছাড়াও ঐতিহাসিক তাবারী একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মুসাইলামা যে আযান প্রথার প্রচলন করেছিল তাতে 'আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'–ও বলা হতো। এভাবে স্পষ্ট করে রিসালাতে মুহাম্মাদীকে স্বীকার করে নেবার পরও তাকে কাফির ও ইসলামী উম্মত বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, বনু হোনায়ফা সরল অন্তকরণে তার ওপর ঈমান এনেছিল। অবশ্য তারা এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাকে তাঁর নবুয়্যাতের কাজে অংশীদার স্থাপন করেছেন। এ ছাড়াও আরেকটি কথা হলো, মদীনা থেকে এক

ব্যক্তি কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং বনু হোনায়ফার কাছে গিয়ে সে কোরআনের আয়াতকে মুসাইলামার প্রতি অবতীর্ণ আয়াত বলে বর্ণনা করেছিল। (আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর)

পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরাম এই মিথ্যাবাদীর ব্যাপারে সামান্য অনুকম্পা প্রদর্শন করেননি। বরং তার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এরপর এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, ইসলাম বহির্ভূত হবার কারণে সাহাবায়ে কেরাম মুসাইলামা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল। ইসলামী যুদ্ধ আইনের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলেও তাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করা যেতে পারে না বরং শুধু মুসলমানই নয় ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, গ্রেফতার করার পর তাকে দাসে পরিণত করা জায়েজ নয়।

কিন্তু মুসাইলামা এবং তার অনুসারীদের বিরদ্ধে যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষণা করেন যে, তাদের মেয়েদের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে দাসে পরিণত করা হবে এবং গ্রেফতার করার পর দেখা গেলো, প্রকৃত অর্থেই তাদেরকে দাসে পরিণত করা হয়েছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাদের মধ্য থেকেই জনৈক যুদ্ধ বন্দিনীর মালিক হন। এই যুদ্ধ বন্দিনীর গর্ভজাত পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াই হলেন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। (আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর)

এই ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোনো বিদ্রোহের অপরাধ ছিল না বরং সে অপরাধ ছিল, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুয়্যাতের দাবী করে এবং কিছু লোকজন তার প্রতি ঈমান আনে। আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই সকল সাহাবা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দান করেন হযরত আবু বকর এবং সাহাবায়ে কেরামের গোটা দলটি একযোগে তাঁর নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষনবী এবং তাঁর পরে কোনো ধরণের ছায়া নবী বা যে কোনো নবীর যে আসার আর অবকাশ নেই, সকল সাহাবায়ে কেরামের এই পদক্ষেপই তো সব চেয়ে বড় প্রমাণ।

সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী দলের মতামত

ইসলামী আইনে সাহাবায়ে কেরামের মতামতের পরে চতুর্থ পর্যায়ের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী কালের ইসলামী চিন্তাবিদগণ। বিষয়টি এদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দীর-যুগের এবং গোটা মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকার ইসলামী চিন্তাবিদগণই সর্বদা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছেন যে, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোনো ব্যক্তি নবী হতে পারে না। এবং তাঁর পর যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করবে এবং যে ব্যক্তি এই মিথ্যা দাবীকে মেনে নেবে বা সমর্থন দেবে, সে সর্বসম্মতভাবে কাফির এবং ইসলামের সীমানায় তার স্থান নেই।' বিখ্যাত আলেমগণ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের ব্যাখায় কি লিখেছেন, তা এখানে পেশ করা হচ্ছে।

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর অভিমত

হযরত ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করে বলেছিল, 'আমাকে সুযোগ দাও, আমি যে নবী তা প্রমাণ করে দেবো এবং নবুয়্যাতের চিহ্ন পেশ করবো।'

এ কথা শুনে খত্‌মে নবুয়্যাতের অতন্দ্র প্রহরী হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা (রাহঃ) দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, **'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যারা নবুয়্যাতের দাবী করবে আর যে ব্যক্তি তাদের কাছে নবী হওয়ার প্রমাণ দাবী করবে সে-ও কাফির হয়ে যাবে।** কারণ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।'

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (২২৪-৩১০ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত কোরআনের তাফসীরে খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-যে নবুয়্যাতকে খতম করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত এর দরোজা আর কারো জন্য খুলবে না। (তাফসীরে ইবনে জারীর, খন্ড-২২, পৃষ্ঠা নম্বর ১২)

আল্লামা ইমাম তাহাবী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (২৩৯-৩২১ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত আকীদাতুস সালাফীয়া গ্রন্থে সালাফে সালেহীন অর্থাৎ প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ নেককারগণ এবং বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আকিদা বিশ্বাস বর্ণনা প্রসঙ্গে নবুয়্যাত সম্পর্কিত এ বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করেন যে, 'আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাহ, নির্বাচিত নবী ও পছন্দনীয় রাসূল এবং শেষনবী, মুত্তাকীদের ইমাম, রাসূলদের সরদার ও রাব্বুল আলামীনের বন্ধু। আর তাঁর পর নবুয়্যাতের প্রত্যেকটি দাবী পথভ্রষ্টতা এবং প্রবৃত্তির লালসার দাসত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। (শারহুত তাহাবীয়া ফিল আকীদাতিস সালাফিয়া, দারুল মা'আরিফ মিশর, ১৫-১০২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে হাজাম আন্দালুস (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা ইবনে হাজাম আন্দালুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) লিখেছেন, 'নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর ওহীর সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। এর সপক্ষে যুক্তি এই যে, ওহী আসে একমাত্র নবীর কাছে এবং মহান আল্লাহ বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।' (আল মুহাল্লা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬)

ইমাম গাজ্জালী (রাহঃ)-এর অভিমত

মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল্লামা ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৪৫০-৫০৫ হিঃ) এ সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সে ব্যাখ্যা মিথ্যা নবীর দাবীদাররা বিকৃত করে কোথাও কোথাও পেশ করে এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছে, ইমাম গাজ্জালী বিশ্বাস করতেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আরো নবী আসবে। এটা তাঁর ওপরে স্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ বৈ আর কিছু নয়। অথচ তিনি লিখেছেন–যদি এ দরজাটি (অর্থাৎ ইজমাকে প্রমাণ হিসেবে মানতে অস্বীকার করার দরজা) খুলে দেয়া হয় তাহলে বড়ই ন্যক্কারজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যেমন যদি কেউ বলে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে অন্য কোনো নবীর আগমন অসম্ভব নয়, তাহলে তাকে

কাফির বলার ব্যাপারে দ্বিধা করা যেতে পারে না। কিন্তু বিতর্কের সময় যে ব্যক্তি তাকে কাফির আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করাকে অবৈধ প্রমাণ করতে চাইবে তাকে অবশ্যই ইজমার সাহায্য নিতে হবে। কারণ নিরেট যুক্তির মাধ্যমে তার অবৈধ হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। আর কোরআন ও হাদীসের বাণীর ব্যাপারে বলা যায়, এ মতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি 'আমার পরে আর কোনো নবী নেই' এবং 'নবীদের মোহর' এ উক্তি দুটোর নানা রকম চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হবে না। সে বলবে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' মানে হচ্ছে অতীব মর্যাদাবান নবীদের আগমন শেষ হয়ে যাওয়া। আর যদি বলা হয়, 'নবীগণ' শব্দটি দ্বারা সাধারাণভাবে সকল নবীকে বুঝানো হয়েছে, তাহলে এই 'সাধারণ' থেকে 'অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী' বের করা তার জন্য মোটেই কঠিন হবে না। 'আমার পর আর নবী নেই' এ ব্যাপারে সে বলে দেবে, 'আমার পর আর রাসূল নেই' এ কথা তো বলা হয়নি। রাসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য আছে। নবীর মর্যাদা রাসূলের চেয়ে বেশী।

মোটকথা এ ধরণের অর্থহীন উদ্ভট কথা অনেক বলা যেতে পারে। আর নিছক শাব্দিক দিক দিয়ে এ ধরণের চুলচেরা ব্যাখ্যাকে আমরা একেবারে অসম্ভবও বলি না। বরং বাহ্যিক উপমার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা এরচেয়েও দূরবর্তী সম্ভাবনার অবকাশ স্বীকার করি। আর এ ধরণের ব্যাখ্যাকারীদের সম্পর্কে আমরা এ কথাও বলতে পারি না যে, কোরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য সে অস্বীকার করছে। কিন্তু এ অভিমতের প্রবক্তার বক্তব্য খন্ডন করে আমি বলবো, মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ শব্দ (অর্থাৎ আমার পর আর কোনো নবী নেই) থেকে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনাবলীর প্রামাণাদি থেকে এ কথাই বুঝেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বুঝানো যে, তাঁর পরে আর কখনো কোনো নবী আসবে না এবং রাসূলও আসবে না। এ ছাড়া মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারেও একমত যে, এর মধ্যে কোন তাবীল, ব্যাখ্যা ও বিশেষিত করারও কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং এহেন ব্যক্তিকে ইজমা অস্বীকারকারী ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগভী (রাহঃ)-এর অভিমত

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল-৫১০ হিঃ) তাঁর তাফসীরে মা'আলিমুত তানজীলে লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ নবুয়্যাতের সিলসিলা খতম করেছেন। সুতরাং তিনিই সর্বশেষ নবী এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন নবী নেই। (তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৮)

আল্লামা যামাখশারী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা যামাখশারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৪৬৭-৫৩৮ হিঃ) তাফসীরে কাশ্শাফে লিখেছেন, যদি তোমরা বলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষনবী কেমন করে হলেন, কারণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শেষ যুগে অবতীর্ণ হবেন, তাহলে আমি বলবো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষনবী হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরে আর কাউকে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হবে না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে নবী বানানো হয়েছে। অবতীর্ণ হবার পর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবেন এবং তাঁর কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবেন। অর্থাৎ তিনি হবেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের মধ্যে শামিল। (দ্বিতীয় খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)

আল্লামা কাজী ইয়ায (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা কাজী ইয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল-৫৪৪ হিঃ) লিখেছেন, যে ব্যক্তি নিজে নবুয়্যাতের দাবী করে অথবা এ কথাকে বৈধ মনে করে যে, যে কোনো ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় নবুয়্যাত লাভ করতে পারে এবং অন্তত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নবীর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে (যেমন কোনো কোনো দার্শনিক এবং বিকৃতমনা সূফী মনে করেন) এবং এভাবে যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করে না অথচ এ কথার দাবী জানায় যে, তার ওপর আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হয়–এ ধরণের সমস্ত লোক কাফির এবং তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। কারণ তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি শেষনবী এবং তাঁর পর আর

কোনো নবী আসবে না এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সংবাদ পৌছেছেন যে, তিনি নবুয়্যাতকে খতম করে দিয়েছেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। সমগ্র মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কথাটির বাহ্যিক অর্থটিকেই গ্রহণীয় এবং এর দ্বিতীয় কোনো অর্থ গ্রহণ করার সুযোগই এখানে নেই। সুতরাং উল্লেখিত দলগুলোর কাফির হওয়া সম্পর্কে কোরআন, হাদীস এবং ইজমার দৃষ্টিতে কোন সন্দেহ নেই। (শিফা, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১)

আল্লামা শাহারিস্তানী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা শাহারিস্তানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল-৫৪৮) তাঁর বিখ্যাত কিতাব আল মিলাল ওয়ান নিহালে লিখেছেন, এবং যে এভাবেই বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরও নবী আসবে (হযরত ঈসা ব্যতীত) তার কাফির হওয়া সম্পর্কে যে কোনো দু'জন ব্যক্তির মধ্যেই কোনো মতবিরোধ থাকতে পারে না। (তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪৯)

ইমাম রাযী (রাহঃ)-এর অভিমত

ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৫৪৩-৬০৬) তাঁর তাফসীরে কবীরে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, এ বর্ণনায় খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দ এ জন্য বলা হয়েছে, যে নবীর পর অন্য কোনো নবী আসবেন তিনি যদি উপদেশ এবং নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কিছু অতৃপ্তি রেখে যান, তাহলে তাঁর পর আগমনকারী নবী তা পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু যার পর আর কোনো নবী আসবে না, তিনি নিজের উম্মাতের ওপর অত্যন্ত বেশী স্নেহশীল হন এবং তাদেরকে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব দান করেন। কারণ, তাঁর দৃষ্টান্ত এমন এক পিতার ন্যায় যিনি জানেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রের দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক এবং পৃষ্ঠপোষক থাকবে না। (তাফসীরে কবীর ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮১)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নবীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তাঁর আগমনের পর নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং বর্তমানে হযরত ঈসার অবতরণের পর তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবেন এ কথা মোটেও অযৌক্তিক নয়। (তাফসীরে কবীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩)

আল্লামা বায়যাবী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা বায়যাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল-৬৮৫ হিঃ) তাঁর তাফসীরে আনওয়ারুত তানজীল-এ লিখেছেন. অর্থাৎ তিনিই শেষনবী। তিনি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিয়েছেন। অথবা তাঁর কারণেই নবীদের সিলসিলার ওপরে মোহর লাগানো হয়েছে। এবং তাঁর পর হযরত ঈসার নাযিল হবার কারণে খত্মে নবুয়্যাতের ওপর কোন দোষ আসছে না। কেননা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের মধ্যেই নাযিল হবেন। (চতুর্থ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

আল্লামা তাফ্তাযানী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা তাফ্তাযানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৭২২-৭৯২ হিঃ) শারহে আকায়েদে নাসাফী গ্রন্থে লিখেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী–এ কথা প্রমাণিত সত্য। যদি বলা হয়, তাঁর পর হাদীসে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে সত্য, তবে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবেন। কারণ তাঁর শারিয়াত বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হবেনা এবং তিনি নতুন বিধানও নির্ধারণ করবেন না। বরং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন। (শারহে আকায়েদে নাসাফী পৃষ্ঠা ১৩৫)

আল্লামা হাফেজ উদ্দীন নাসাফী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা হাফেজ উদ্দীন নাসাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল ৮১০ হিঃ) তাঁর তাফসীরে মাদারেকুত তানজীল-এ লিখেছেন, এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যীন। অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো ব্যক্তিকে নবী করা হবে না। হযরত ঈসার ব্যাপার হলো, তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এবং পরে যখন তিনি নাযিল হবেন, তখন তিনি হবেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারিয়াতের অনুসারী। অর্থাৎ তিনি হবেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। (তাফসীরে মাদারেকুত তানজীল, পৃষ্ঠা ৪৭১)

আল্লামা আলাউদ্দীন বাগদাদী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা আলাউদ্দীন বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল ৭২৬ হিঃ) তাঁর তাফসীরে 'খাজিন'-এ লিখেছেন, ওয়া খাতামান নাবিয়্যীন অর্থাৎ আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যাত খতম করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পর আর কোনো নবুয়্যাত নেই এবং এ ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদারও নয়। ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন আলিমা অর্থাৎ আল্লাহ এ কথা জানেন যে, তাঁর পর আর কোনো নবী নেই। (তাফসীরে খাজিন-৪৭১-৪৭২)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল, ৭৭৪ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর– তাফসীরে ইবনে কাসীরে লিখেছেন, এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো নবী নেই, তখন অপর কোনো রাসূলেরও প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ রিসালাত একটা বিশেষ পদমর্যাদা এবং নবুয়্যাতের পদমর্যাদা এর চেয়েও বেশী সাধারণধর্মী। প্রত্যেক রাসূল নবী হন কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল হন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যে ব্যক্তিই এই পদমর্যাদার দাবী করবে, সেই হবে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল এবং পথভ্রষ্ট। যতোই সে আলৌকিক ক্ষমতা ও যাদুর ক্ষমতাসম্পন্ন হোক না কেনো, তার দাবী গ্রহণীয় নয়। কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ব্যক্তি এই পদমর্যাদার দাবী করবে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা হবে এই ধরণের। (তাফসীরে ইবনে কাসীরে তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৩-৪৯৪)

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল ৯১১ হিঃ) তাঁর তাফসীরে জালালাঈন-এ লিখেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী নেই এবং ঈসা আলাইহিস সালাম নাযিল হবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়াত মোতাবেকই আমল করবেন। (তাফসীরে জালালাঈন পৃষ্ঠা ৭৬৮)

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল ৯৭০ হিঃ) উসূলে ফিকাহর বিখ্যাত গ্রন্থ আল ইশবাহ ওয়ান নাযায়েরে কিতাবুস সিয়ারের বাবুর রুইয়ায় লিখেছেন, যদি কেউ এ কথা মনে না করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষনবী, তাহলে সে মুসলমান নয়। কেননা, কথাগুলো জানা এবং স্বীকার করে নেয়া দ্বীনের অপরিহার্য আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে শামিল। (আল ইশবাহ ওয়ান নাযায়েরে কিতাবুস সিয়ারের বাবুর রুইয়া পৃষ্ঠা ১৭৯)

আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা মুল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল ১০১৬) শারহে ফিকহে আকবার-এ লিখেছেন, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর অন্য কোন ব্যক্তির নবুয়্যাতের দাবী করা সর্ববাদী সম্মতভাবে কুফ্র। (শারহে ফিকহে আকবার পৃষ্ঠা ২০২)

আল্লামা শায়খ ইসমাঈল হাক্কী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা শায়খ ইসমাঈল হাক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল ১১৩৭ হিঃ) তাফসীরে রুহুল বয়ান-এ উল্লেখিত ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন, আলেম সমাজ খাতাম শব্দটির 'তা' অক্ষর-এর ওপর জবর দিয়ে পড়েছেন। এর অর্থ হয় খতম করবার যন্ত্র। যার সাহায্যে মোহর লাগানো হয়। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবীর শেষে এসেছেন এবং তাঁর সাহায্যে নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ফারসীতে আমরা একে বলবো মোহরে পয়গম্বর–অর্থাৎ তাঁর সাহায্যে নবুয়্যাতের দরজা মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং পয়গম্বরদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। কিছু সংখ্যক পাঠক খাতাম শব্দের 'তা' অক্ষরের নীচে জের দিয়ে পড়েছেন, খাতিমুন নাবিয়্যীন। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মোহর দানকারী। অন্য কথায় বলা যাবে পয়গম্বরদের ওপর মোহরকারী। এভাবে এ শব্দার্থ খাতাম-এর সমার্থক হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর উম্মাতের আলেম সমাজ তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন একমাত্র তাঁর প্রতিনিধি। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথেই নবুয়্যাতের উত্তরাধিকারেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং

তাঁর পরে হযরত ঈসার নাযিল হবার ব্যাপারটি তাঁর নবুয়্যাতকে ত্রুটিযুক্ত করবে না। কেননা খাতম্মিন নাবিয়্যীন হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পর আর কাউকে নবী বানানো হবে না এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁদের পূর্বেই নবী বানানো হয়েছে।

সুতরাং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে শামিল হবেন। তাঁর কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবেন এবং তাঁরই উম্মতের অন্তরভুক্ত হবেন। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে ওহী অবতীর্ণ হবে না। তিনি কোনো নতুন আইন-কানুনও জারী করবেন না। বরং তিনি হবেন তাঁর প্রতিনিধি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, আমাদের নবীর পর আর কোনো নবী নেই। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষনবী। এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে কোনো নবী নেই। সুতরাং এখন যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবী আছে, তাকে কাফির বলা হবে। কারণ সে কোরআনকে অস্বীকার করেছে এবং এবং অনুরূপভাবে সে ব্যক্তিকেও কাফির বলা হবে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। কেননা সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের পর হক বাতিল থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যাতের দাবী করবে, তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ২২ খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

ফতোওয়ায়ে আলমগিরীর অভিমত

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের নির্দেশে ১২ শত হিজরীতে পাক-ভারতের বিশিষ্ট আলেমগণ সম্মিলিতভাবে ফতোওয়ায়ে আলমগিরী নামে যে কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেন তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষনবী নন, তাহলে সে মুসলমান নয় এবং যদি সে বলে যে, আমি আল্লাহর রাসূল অথবা পয়গম্বর, তাহলে তার ওপর কুফরীর ফতোওয়া দেয়া হবে। (ফতোওয়াতে আলমগিরী, দ্বিতীয় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শওকানী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা শওকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ইন্তেকাল ১২৫৫ হিঃ) তাফসীরে ফাতহুল কাদির-এ লিখেছেন, সমগ্র মুসলিম সমাজ খাতিম শব্দটির তা অক্ষর-এর নীচে জের দিয়ে পড়েছেন এবং একমাত্র আসেম জবর দিয়ে পড়েছেন। প্রথমটার অর্থ হলো এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত পয়গম্বরকে খতম করেছেন অর্থাৎ তিনি সবার শেষে এসেছেন এবং দ্বিতীয়টির হলো এই যে, তিনি সমস্ত পয়গম্বরদের জন্য মোহর স্বরূপ। এবং এর সাহায্যে নবীদের সিলসিলা মোহর এঁটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের দলটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। (তাফসীরে ফাতহুল কাদির, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৫)

আল্লামা আলুসি (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা আলুসি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃত্যু ১২৮০ হিঃ) তাফসীরে রুহুল মা'আনী-তে লিখেছেন, নবী শব্দটি রাসূলের চেয়ে বেশী ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক। সুতরাং বিশ্বনবীর খাতিমুন নাবিয়্যীন হবার অর্থ হলো এই যে, তিনি খাতিমুল মুরসালীনও। তিনি শেষনবী এবং শেষ রাসূল–এ কথার অর্থ হলো এই যে, এ পৃথিবীতে তাঁর নবুয়্যাতের গুণে গুণান্বিত হবার পরেই মানুষ এবং জিনের মধ্য থেকে এ গুণটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যে ব্যক্তি ওহীর দাবী করবে তাকে কাফির বলে গণ্য করা হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। তিনিই শেষনবী–এ কথাটি কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, রাসূলের সুন্নাত এটিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছে এবং সমগ্র মুসলিম সমাজ এর ওপর আমল করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এর বিরোধী কোন দাবী করবে, তাকে কাফির বলে গণ্য করা হবে। ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব প্রদত্ত নবুয়্যাতের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কারণ তিনি নিজের আগের পদমর্যাদা থেকে তো অপসারিত হবেন না। কিন্তু নিজের পূর্বের শরীয়াতের অনুসারী হবেন না। কারণ তা তাঁর নিজের ও অন্যসব লোকদের জন্য বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং বর্তমানে তিনি মূলনীতি থেকে খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতের অনুসারী হবেন। কাজেই তাঁর কাছে ওহী অবতীর্ণ হবে না এবং তিনি শরীয়াতের বিধানও

নির্ধারণ করবেন না। বরং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি এবং তাঁর উম্মাতের মধ্যস্থিত মুহাম্মাদী মিল্লাতের শাসকদের মধ্য থেকে একজন শাসক হবেন। (তাফসীরে রুহুল মা'আনী ২২ খন্ড পৃষ্ঠা ৩২-৩৮-৩৯)

সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলিম, ইসলামী আইনবিদ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরীনে কেরামের ব্যাখ্যা এবং মতামত হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন শেষনবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসার পথ উন্মুক্ত নেই। আর এসব মতামত থেকে এ কথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলামী চিন্তাবিদগণ একযোগে আল কোরআনের খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের অর্থ নিয়েছেন শেষনবী। প্রত্যেক যুগের মুসলমানই এই একই আকীদা পোষণ করেছেন যে, বিশ্বনবীর পর নবুয়্যাতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। এ কথা তাঁরা একযোগে স্বীকার করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবী অথবা রাসূল হবার দাবী করে এবং যে তার দাবীকে মেনে নেয়, সে কাফির হয়ে যায়, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো যুগে সামান্যতম মতবিরোধও সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই ফায়সালা করতে পারেন যে, খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের যে অর্থ আরবী অভিধান থেকে প্রমাণিত হয়, কোরআনের আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং যা ব্যাখ্যা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যে সম্পর্কে মতৈক্য পোষণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম সমাজ একযোগে দ্ব্যর্থহীনভাবে যা স্বীকার করে আসছেন, তার বিপক্ষে দ্বিতীয় কোনো অর্থ গ্রহণ অর্থাৎ কোনো নতুন দাবীদারের জন্য নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত করার অবকাশ ও সুযোগ থাকে কি ? এবং এই ধরণের লোকদেরকে কেমন করে মুসলমান বলে স্বীকার করা যায়, যারা নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত করার নিছক ধারণাই প্রকাশ করেনি বরং ঐ দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি নবুয়্যাতের দালানে প্রবেশ করেছে এবং তারা তার নবুয়্যাতের ওপর ঈমান পর্যন্ত এনেছে? আর ঐসব লোকদেরকেই বা কোন্ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা যাবে, যারা ভন্ডনবীর অনুসারীদেরকে সমর্থন করে এবং তাদের অনুষ্ঠান বা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেয় অথবা তাদেরকে সমর্থন করে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করে?

ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা

ইসলামে নবুয়্যাতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা কোরআনের দৃষ্টিতে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাসের একটি। এর প্রতি স্বীকৃতি দেয়া বা অস্বীকার করার ওপর মানুষের ঈমান ও কুফ্রী একান্তভাবেই নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি যদি নবী হয় এবং লোকজন তাকে নবী বলে অস্বীকার করে, তাহলে তারা কাফির হয়ে যায়। আবার কোনো ব্যক্তি নবী নয় কিন্তু যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে, তারাও কাফির হয়ে যায়। এ ধরণের জটিল পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রকার অসতর্কতার আশা করা যায় না বা আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা দেবেন না, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে এ ব্যাপারে অস্পষ্টতার মধ্যে ছেড়ে দেবেন, এমনটি কল্পনাও করা যায় না। যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোনো নবী আসার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই কোরআনে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করতেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে তা ঘোষণা করতেন। কেননা, তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, যাবতীয় ব্যাপারে বান্দাকে পথপ্রদর্শন করার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। (সূরা আন্ নাহ্‌ল-৯)

এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না তিনি সমগ্র উম্মাতকে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে অবগত করতেন যে, তাঁর পর আরো নবী আসবেন এবং আমরা সবাই তাঁদের প্রতি স্বীকৃতি দিতে ও তাঁদের আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবো। এটা কিভাবে সম্ভব যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত থাকবে এবং এই দরজা দিয়ে কোনো নবী প্রবেশ করবে, যার ওপর ঈমান না আনলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না। অথচ আমাদের এ সম্পর্কে শুধু অজ্ঞই রাখা হয়নি বরং আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল একযোগে এমন সব কথা বলেছেন, যার ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত উম্মাত এ কথা মনে করে আসছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষনবী এবং তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না? আমাদের সাথে

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যবহার কেনো এমন হবে? আমাদের দ্বীন ও ঈমানের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের তো কোনো শত্রুতা নেই। পৃথিবীতে মুসলমান থাকা না থাকা এবং পরকালে মুক্তি বা গ্রেফতার হওয়া যে বিষয়টির ওপর নির্ভরশীল, সেই বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল মানুষকে অন্ধকারে রাখবেন, এ কথা কিভাবে চিন্তা করা যেতে পারে?

যদি এ কথা তর্ক সাপেক্ষে গ্রহণ করা হয় যে, নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে এবং কোনো নবী আসার পর আমরা যদি সন্দেহাতীতভাবে, অসংকোচে, নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে তার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি, তাহলে সংশয় থাকতে পারে একমাত্র মহান আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের! কিন্তু কিয়ামতের দিন তিনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পেশকৃত খত্‌মে নবুয়্যাতের দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করবো। তাহলে অন্তত প্রমাণ হয়ে যাবে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতই আমাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী নবীকে অস্বীকার করার এই কুফ্‌রীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, এসব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করার পর কোনো নতুন নবীর ওপর ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে গ্রেফতার করবেন না। কিন্তু যদি প্রকৃতপক্ষেই নবুয়্যাতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে (অবশ্যই বন্ধ হয়ে গিয়েছে) এবং কোনো নতুন নবী যদি না আসতে পারে (অবশ্যই আসতে পারে না) এবং এসব সত্ত্বেও কেউ কোনো নবুয়্যাতের দাবীদারের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তার ভয় করা উচিত যে, খত্‌মে নবুয়্যাতের ব্যাপারে যাবতীয় দলিল-প্রমাণ মওজুদ থাকার পরে আরেকজনকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে যে কুফ্‌রীর অপরাধে নিজেকে জড়িত করলো, এই অপরাধের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ পাবার জন্য সে মহান আল্লাহর দরবারে এমন কি দলিল-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবে!

পৃথিবীর এই ক্ষণিকের জীবন দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই জীবন শেষ হবার পূর্বে এবং মহান আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হবার আগেই তার নিজের জবাবদিহির জন্য যদি কোনো দলিল-প্রমাণ সংগ্রহ করে থাকেনও তাহলে সে দলিল-প্রমাণ কোরআন-সুন্নাহর মানদন্ডে যাচাই করে নেয়া উচিত এবং আমরা কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে যেসব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার চিন্তা করা

প্রয়োজন যে, নিজের জন্য যে ঠুন্‌কো যুক্তির ওপর নির্ভর করে সে নবুয়্যাতের দাবী করেছে এবং তার ওপরে যারা ঈমান এনেছে, তার এবং তার অনুসারীদের অবৈধ কার্যক্রম, সভা-সমাবেশ, সম্মেলন ও প্রকাশনার প্রতি যারা আচার-আচরণ, বক্তৃতা, বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমে সমর্থন যুগিয়েছে, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কি এসব ঠুন্‌কো, অসত্য বিষয়াবলীর ওপর নির্ভর করে আদালতে আখিরাতে কুফ্‌রীর শাস্তি ভোগ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সম্মত হবে? পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি যাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে, তাদের পক্ষে রাজনৈতিক স্বার্থে অথবা রাষ্ট্রক্ষমতার লোভে এই ধরনের হঠকারিতা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

বিশ্বনবীর পরে আর নবুয়্যাতের প্রয়োজনীয়তা নেই

বোখারী হাদীসে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ইয়াহূদী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বলেছিলেন, হে ওমর! তোমাদের কোরআনে এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ আয়াতটি যদি আমাদের ওপরে অবতীর্ণ হতো, তাহলে সেই অবতীর্ণের দিনটিকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করতাম। হযরত ওমর বললেন, হে ইয়াহূদী! আমার স্পষ্ট স্মরণে রয়েছে, সেই আয়াতটি কোন্ আয়াত, তা কখন কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কোথায় অবস্থান করছিলেন। সেদিনটি ছিলো আরাফাতের দিন, ৯ই জিলহজ্জ। আল্লাহর রাসূল আরাফাতে মসজিদে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। সে সময় ঐ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا–

আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থাকে) তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে কবুল করে নিয়েছি। (সূরা মায়িদা-৩)

ইয়াহূদী বললো, 'হে ওমর! তোমরা তো একটি ঈদ উদযাপন করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা আসার পরে তোমাদের তো দুটো ঈদ উদযাপন করা উচিত।' হযরত ওমর বললেন, 'আমরা দুটো ঈদই উদযাপন করি। আল্লাহর কোরআন যে রাতে নাযিলের সূচনা হয়েছিল সে রাত ছিল লাইলাতুল কদরের রাত। অর্থাৎ অগণিত রাতের চেয়ে সে রাতটি উত্তম। কোরআন নাযিলের সূচনা হওয়ার কারণে

আমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করি। আর কোরআন যেদিন অবতীর্ণ হওয়া শেষ হলো, অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নি'মাতকে তথা ইসলামকে যেদিন পরিপূর্ণ করে দেয়ার ঘোষণা দিলেন, সেদিনটি ছিলো ৯ই জিলহজ্জ। এ কারণে আমরা তারপরের দিনই ঈদ উদযাপন করেছি। সে ঈদটি হলো ঈদুল আজহা। সুতরাং আমরা দুটো ঈদই উদযাপন করে থাকি।'

বিষয়টি এখানে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নতুনভাবে কোনো নবী-রাসূল বা মানুষের জন্য জীবন ব্যবস্থা আসার অবকাশ নেই। শেষনবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। মানবজাতী কিয়ামত পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান লাভ করেছে, এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে আনন্দ-উৎসব করার আদেশ দিয়েছেন। সেই আনন্দ-উৎসবের দিন হলো ঈদের দিন। অর্থাৎ জীবন বিধান নাযিলের সূচনা করা হলো যে মাসে, সেই মাসে একটি আনন্দ-উৎসব করতে হবে এবং যে মাসে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সেই মাসে আরেকটি আনন্দ-উৎসব করতে হবে। এ কারণেই মুসলমানদের জন্য দুই ঈদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, নবুয়্যাত চেয়ে নেয়ার কোনো জিনিস নয়। সাধনা করে লাভ করারও কোনো জিনিস নয়। গোটা জীবন ব্যাপী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মতো কাজ করেও নবুয়্যাত লাভ করা যায় না। সে ব্যক্তির ভেতরে নবীর গুণাবলী সৃষ্টি হতে পারে না। নবুয়্যাতের যোগ্যতা কোনো অর্জন করার জিনিস নয়। কোন বিরাট খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ মানুষকে নবুয়্যাত দান করা হয় না। সারা দুনিয়ার মানুষ কোনো ব্যক্তি বিশেষকে ভোট দিয়ে বা তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেও নবী-রাসূল নির্বাচিত করতে পারে না। বরং বিশেষ প্রয়োজনের সময় যখন উপস্থিত হয়েছিল তখনই হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'য়ালা নবুয়্যাতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি, তখন শুধু শুধু আল্লাহ তা'য়ালা নবীর পর নবী প্রেরণও করেননি। আল্লাহর কোরআন থেকে যখন আমরা এ কথা অবগত হবার চেষ্টা করি যে, কোন্ পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে নবী প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, তখন সেখানে নবী-রাসূল প্রেরণের চারটি অবস্থা বর্তমান বিরাজিত ছিল। সে চারটি অবস্থা হলো–

(১) কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ইতোপূর্বে কোনো নবী-রাসূল আসেনি এবং অন্য কোনো জাতির মধ্যে প্রেরিত নবীর শিক্ষাও তাদের কাছে পৌছেনি।

(২) নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জাতি ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূলের শিক্ষা ভুলে যায় অথবা তা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(৩) ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূলের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং দ্বীনের পূর্ণতার জন্য অতিরিক্ত নবীর প্রয়োজন হয়।

(৪) কোনো নবী-রাসূলের সাথে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আরেকজন নবীর প্রয়োজন হয়।

সুতরাং এখন এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ওপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটি অবস্থাও আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে বিদ্যমান নেই। কোরআন স্বয়ং ঘোষণা করেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য হিদায়াতকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ কথা বলে যে, তাঁর নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র পৃথিবীতে এমন অবস্থা বিরাজ করছে যে, যাতে করে তাঁর নবুয়্যাত সবসময় পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে পৌছতে পারে। এরপরে আর প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক নবী প্রেরণের প্রয়োজন থাকে না। কোরআন, হাদীস ও সীরাতের যাবতীয় বর্ণনাও এ কথার সাক্ষ্যবহন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং নির্ভেজাল কাঠামো ও অবয়বে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোনো প্রকার বিকৃতি বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি। তাঁর ওপরে যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল তার ভেতরে আজ পর্যন্ত একটি অক্ষর বা শব্দেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি এবং কিয়ামত পর্যন্তও তা হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেসব আদেশ-নিষেধ আজ আমরা এমনভাবে পেয়ে যাচ্ছি, যেন আমরা তাঁরই যুগে বাস করছি। সুতরাং নবী আসার কোনো প্রয়োজনই থাকতে পারে না।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন এ কথা ঘোষণা করেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণতা দান করা হয়েছে। সুতরাং দ্বীনের

পূর্ণতার জন্যও কোনো নতুন নবী আসার আর প্রয়োজন নেই। তাঁর কাজের সহযোগিতা করার জন্য যদি কোনো সাহায্যকারী নবীর প্রয়োজন হতো, তাহলে সেটা তাঁর জীবনকালেই আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রেরণ করতেন। এ ধরণের কোনো প্রয়োজন ছিল না বিধায় মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তা করেননি। বর্তমানে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, নবীকে পৃথিবীতে আসতেই হবে? কেউ যদি যুক্তি প্রদর্শন করে, মুসলিম জাতি পথ ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এ কারণে তাদের সংস্কারের জন্য একজন নতুন নবীর প্রয়োজন। এই যুক্তি যারা দিতে চায় তাদের কাছে ইসলামী চিন্তাবিদদের জিজ্ঞাসা, নিছক সংস্কারের জন্য পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কি কোনো নবী এসেছে যে– শুধু এই উদ্দেশ্যেই আর একজন নতুন নবীর আগমন ঘটলো? ওহী অবতীর্ণ করার জন্যই তো নবী প্রেরণ করা হয়। কেননা, নবীর কাছেই ওহী অবতীর্ণ করা হয়। আর ওহীর প্রয়োজন পড়ে কোনো নতুন পয়গাম দেয়ার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহর কোরআন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর যখন আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং ওহীর সমস্ত সম্ভাব্য প্রয়োজন খতম হয়ে গিয়েছে, তখন সংস্কারের জন্য একমাত্র সংস্কারের প্রয়োজনই অবশিষ্ট রয়েছে, নতুন কোনো নবীর নয়। আর এই সংস্কারের মহান কাজটি আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যুগের প্রয়োজনে এমন ধরনের হক্কানী আলিম-উলামা, মাশায়েখদের উত্থান ঘটান যে, তাঁদের মাধ্যমেই শির্ক-বিদ্আতের পুঞ্জিভূত আবর্জনা অপসারিত হয়ে থাকে।

নতুন নবীর আগমন– বুনিয়াদী মতবিরোধ

যখন কোনো জাতির মধ্যে নতুন নবী-রাসূলের আগমন ঘটবে, তখনই সেখানে প্রশ্ন উঠবে কুফ্‌র ও ঈমানের। যারা ঐ নবী-রাসূলের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তার আনুগত্য করবে, তারা এক সম্প্রদায় ভুক্ত হবে এবং যারা তার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তার আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকবে, তারা অবশ্যই একটি পৃথক সম্প্রদায়ে পরিগণিত হবে। এই দুই সম্প্রদায়ের মতবিরোধ কোনো আংশিক মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না বরং এটি এমন একটি বুনিয়াদী মতবিরোধের পর্যায়ে নেমে আসবে, যার ফলে তাদের একটি দল যতদিন না নিজের আকিদা-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা দু'দল কখনো একত্র হতে পারবে না। এ ছাড়াও বাস্তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য জীবন ব্যবস্থা এবং আইনের উৎস হবে বিভিন্ন। কেননা একটি দল তাদের নিজেদের নবীর ওহী এবং সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়ন করবে এবং দ্বিতীয় দলটি এ দুটোকে তাদের আইনের উৎস হিসেবেই মেনে নিতে প্রথমত অস্বীকার করবে। সুতরাং এই দুই দলের মিলনে একটি সমাজ বা জাতি কোনোক্রমেই গঠিত হতে পারে না। নবী-রাসূলদের যুগের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, নবী-রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী ও তাঁদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী– এই দুই দল সম্মিলিতভাবে কোনো সমাজ বা জাতি গঠন করতে পারেনি।

এই চরম সত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর যে কোনো ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, খত্‌মে নবুয়্যাত মুসলিম জাতির জন্য মহান আল্লাহর বিরাট রহমত স্বরূপ। এর বিনিময়েই সমগ্র মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে অন্তর্ভূক্ত হতে পেরেছে। এই খত্‌মে নবুয়্যাতের বিষয়টি মুসলমানদেরকে এমন সব মৌলিক মতবিরোধ থেকে সুরক্ষা করেছে, যা তাদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের বীজ বপন করতো। সুতরাং যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিদায়াত দানকারী এবং একমাত্র অনুসরণীয় নেতা বলে স্বীকার করে এবং তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো হিদায়াতের উৎসের দিকে অগ্রসর হতে চায় না, সে বর্তমানে এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে। নিজেকে মুসলিম মিল্লাতের একজন বলে ঘোষণা দিতে সক্ষম হবে। নবুয়্যাতের দরজা বন্ধ না হয়ে গেলে মুসলিম মিল্লাত কখনো এই ঐক্যের সন্ধান পেতো না। কারণ প্রত্যেক নতুন নবীর আগমনের পরে এই ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। সাধারণ স্থূলভাবে চিন্তা করলেও

মানুষের বিবেক বুদ্ধিও এ কথার প্রতিই সমর্থন করে যে, একটি বিশ্বজনীন এবং পরিপূর্ণ দ্বীন তথা জীবন বিধান অবতীর্ণ করার পর এবং সে জীবন বিধানকে সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষিত করার পর নবুয়্যাতের দরজা রুদ্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। এর ফলে সম্মিলিতভাবে এই শেষনবীর অনুগমন করে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান চিরকালের জন্য একই উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারবে এবং প্রয়োজন ব্যতীত নতুন নতুন নবী-রাসূল আগমনে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বার বার বিভেদ সৃষ্টি হতে পারবে না। নতুন নবুয়্যাতের দাবীদারদের ভাষায় নবী 'যিল্লী অর্থাৎ ছায়া নবী' হোক অথবা বুরুজী নবী হোক, উম্মাতের অধিকারী হোক, শরীয়াতের অধিকারী হোক বা কিতাবের অধিকারী হোক–যে কোনো অবস্থায়ই যিনি নবী হবেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে প্রেরণ করা হবে, তাঁর আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল যা দাঁড়াবে তাহলো, তাঁর প্রতি ঈমান এনে যারা তাঁর অনুসরণ করবে, তারা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শামিল হবে। আর যারা তাকে অবিশ্বাস করে তাঁর আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকবে, তারা কাফির বলে গণ্য হবে। অতীতে যখন নবী প্রেরণের সত্যিকারের প্রয়োজন হয়েছিল, তখনই–শুধু মাত্র তখনই এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল, বর্তমানে হয়নি।

পক্ষান্তরে যখন নতুন নবী আগমনের কোনো প্রয়োজন থাকে না, তখন আল্লাহর হিক্‌মাত এবং তাঁর রহমতের কাছে কোনক্রমেই আশা করা যায় না যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে শুধু শুধু কুফর ও ঈমানের সংঘর্ষে লিপ্ত করবেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হবার সুযোগ দিবেন না। সুতরাং কোরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য ও সমস্ত আলিমদের ঐকমত্য থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয়, মানুষের বিবেক, বুদ্ধিও তাকে নির্ভুল বলে স্বীকার করে এবং তা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে বর্তমানে নবুয়্যাতের দরজা বন্ধ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই দরজা উন্মুক্ত হবার কোনো সম্ভাবনা আল্লাহ তা'য়ালা রাখেননি। সুতরাং কেউ যদি নতুন কোনো নবীর অনুসারী হয় এবং 'কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়- এ বিষয়টি আল্লাহ নির্ধারণ করবেন' এ ধরনের কথা বলে রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের প্রতি সমর্থন দেয়, তাহলে তাদের উচিত নিজেদেরকে মুসলিম মিল্লাত বহির্ভূত জনগোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করা।

একদিকে ভন্ডনবীর অনুসারী কাদিয়ানীদের সমর্থনে বিবৃতি দেয়া হবে, অপরদিকে নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করে মুসলিম সমাজ থেকে যাবতীয় সুযোগ গ্রহণ করা হবে, মক্কা-মদীনায় গমন করে মাথায় পট্টি আর হাতে তস্‌বীহ্ ধারণ করে মুসলিম মিল্লাতের সাথে প্রতারণা করা হবে, এই প্রতারণা মুসলিম মিল্লাত কোনোক্রমেই বরদাস্‌ত করবে না। যথা সময়ে তারা এসব প্রতারকদের মুখোশ উন্মোচন করে ছাড়বে ইন্‌শাআল্লাহ্।

খত্‌মে নবুয়্যাত এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্

যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবী আসবে বলে ধারণা করে এবং বর্তমানে যারা নতুন নবুয়্যাতের দিকে আহ্বান জানায়, তারা সাধারণত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বলে থাকে যে, হাদীসে বলা হয়েছে 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' আসবেন। আর মসীহ্ কোনো নবী ছিলেন না। সুতরাং তার আগমনের ফলে খত্‌মে নবুয়্যাতের বিশ্বাস কোনোভাবেই প্রভাবিত হচ্ছে না, বরং খত্‌মে নবুয়্যাত এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর আগমন দুটোই সমপর্যায়ের। হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম প্রতিশ্রুত মসীহ্ নন, কারণ তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। আর হাদীসে যার আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে তিনি হলেন, মাসীলে মসীহ্ বা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুরূপ একজন মসীহ্ এবং তিনিই হলেন মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। তাকে মেনে নিলে খত্‌মে নবুওয়াতে অবিশ্বাস করা হয় না।

এই প্রতারকদের প্রতারণার আবরণ ছিন্ন করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ শাণিত তরবারীর ন্যায় কোষমুক্ত হয়ে রয়েছে। রাসূলের এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ প্রত্যক্ষ করে যে কোনো ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন, আর এই কাদিয়ানী তথা আহমাদিয়া জামায়াত তা বিকৃত করে কিভাবে প্রচার করছে।

হযরত আবু হুরাইরা র্বণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়াম ন্যায় বিচারক শাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং যুদ্ধ শেষ করে দেবেন। (বর্ণনান্তরে যুদ্ধের পরিবর্তে জিযিয়া শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ জিযিয়া শেষ করে দেবেন)। তখন সম্পদের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না এবং

(অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে, মানুষ আল্লাহর জন্য) একটি সিজ্‌দা করাকে দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে করবে। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

এ হাদীসে ক্রুশ ধ্বংস করার ও শূকর হত্যা করার অর্থ হলো, একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে খৃষ্টান ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। খৃষ্টান ধর্মের সমগ্র কাঠামোটা এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তানকে অর্থাৎ হযরত ঈসাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে অভিশাপে পরিপূর্ণ মৃত্যু দিয়েছেন। আর এতেই সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য নবীদের উম্মাতের সাথে খৃষ্টানদের পার্থক্য হলো এই যে, এরা শুধু আকীদাটুকু গ্রহণ করেছে, এরপর মহান আল্লাহর সমস্ত আইনই নাকচ করে দিয়েছে। এমনকি শূকরকেও এরা হালাল করেছে, যা সমস্ত নবীর শরীয়াতে হারাম। সুতরাং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজে এসে যখন বলবেন, আমি আল্লাহর পুত্র নই, আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়নি এবং আমি কারো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিনি, তখন খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদই সমূলে উৎপাটিত হবে। অনুরূপভাবে যখন তিনি বলবেন, আমার অনুসারীদের জন্য আমি শূকর হালাল করিনি এবং তাদেরকে শরীয়াতের বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তিও দেইনি, তখন খৃষ্টানদের ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও নির্মূল হয়ে যাবে। আর জিযিয়া শেষ হয়ে যাবে বলতে বুঝায়, তখন ধর্মের বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষ একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করবে। এর ফলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না এবং কারো কাছ থেকে জিযিয়াও আদায় করা হবে না।

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন-ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ না পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।' এসব হাদীসের অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে বোখারী শরীফের কিতাবুল মাজালিম, বাবু কাসরিস সালিব-ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিতনাতিদ দাজ্জাল। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে-হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেন, তোমাদের মধ্যে ইবনে মার্‌য়াম অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম নিজেদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন। (বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

অর্থাৎ হযরত ঈসা নামাযে ইমামতি করবেন না। মুসলমানদের পূর্ব নিযুক্ত ইমামের পেছনে তিনি নামাজ আদায় করবেন। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে-হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, ঈসা ইবনে মার্‌য়াম অবতীর্ণ

হবেন। এরপর তিনি শূকর হত্যা করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন। তাঁর জন্য একাধিক নামায এক ওয়াক্তে আদায় করা হবে। তিনি এতো ধন-সম্পদ বিতরণ করবেন যে, অবশেষে তার গ্রহীতা পাওয়া যাবে না। তিনি খিরাজ মওকুফ করে দেবেন। রওহা (মদীনা থেকে ২৫ মাইল দূরে একটি স্থানের নাম) নামক স্থানে অবস্থান করে তিনি সেখান থেকে হজ্ব অথবা ওমরাহ করবেন অথবা দুটোই করবেন। (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ) (কাদিয়ানীরা মীর্জা গোলাম আহ্মদকে এ যুগের মাসীলে মাসীহ্ বলে থাকে, অথচ এই মীর্জা সাহেব জীবনে কখনো হজ্জ বা উমরাহ্ করেনি।)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, দাজ্জালের আবির্ভাব বর্ণনার পর আল্লাহর রাসূল বলেন, মুসলমানরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে, সারিবদ্ধ হতে থাকবে এবং নামাযের জন্য একামাত পাঠ করা শেষ হবে, তখন ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন। আল্লাহর দুশমন দাজ্জাল তাঁকে দেখেই এমনভাবে গলিত হতে থাকবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ইবনে মারিয়াম তাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দেন, তাহলেও সে বিগলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে ইবনে মারিয়ামের হাতে কতল করবেন তিনি দাজ্জালের রক্তে রঞ্জিত নিজের বর্শাফলক মুসলমানদের দেখাবেন। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আমার এবং তাঁর (ঈসার) মাঝখানে আর কোনো নবী নেই এবং তিনি অবতীর্ণ হবেন। তাঁকে দেখা মাত্রই তোমরা চিনে নিয়ো। তিনি মাঝারি ধরণের লম্বা হবেন। বর্ণ লাল-সাদায় মেশানো। পরনে দুটো হলুদ রঙের কাপড়। তাঁর মাথার চুল থেকে মনে হবে এই বুঝি পানি টপকে পড়লো। অথচ তা মোটেও সিক্ত হবে না। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের সাথে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন। শূকর হত্যা করবেন। জিযিয়া কর রহিত করবেন। তাঁর যুগে মহান আল্লাহ ইসলাম ব্যতীত সমস্ত আদর্শকেই নির্মূল করে দিবেন। তিনি মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং পৃথিবীতে ৪০ বছর অবস্থান করবেন। তারপর তাঁর ইন্তেকাল হবে এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযা আদায় করবে। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত জাবের ইবেন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন। মুসলমানদের নেতা তাঁকে বলবেন, আসুন, আপনি

নামায পড়ান। কিন্তু তিনি বলবেন, না তোমরা নিজেরাই একে অপরের নেতা। মহান আল্লাহ এই উম্মাতকে যে ইজ্জত দান করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ কথা বলবেন। (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইবনে সাইয়াদ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন, আমি তাকে হত্যা করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এর হত্যাকারী নও, বরং ঈসা ইবনে মারয়াম একে হত্যা করবেন এবং যদি এ সেই ব্যক্তি না হয়ে থাকে, তাহলে জিম্মীদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করার তোমার কোনো অধিকার নেই। (মিশকাত)

হযরত জাবের ইবেন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, (দাজ্জাল প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল বলেছেন) সেই সময় ইবনে মারয়াম হঠাৎ মুসলমানদের মধ্যে উপস্থিত হবেন। লোকেরা নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তাঁকে বলা হবে, হে রুহুল্লাহ! অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি বলবেন, না, তোমাদের ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া উচিত। তিনিই নামায পড়াবেন। এরপর ফজরের নামাযের পর মুসলমানরা দাজ্জালের মোকাবেলায় বের হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন সেই মিথ্যাবাদী হযরত ঈসাকে দেখবে তখন বিগলিত হতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। এরপর তিনি দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তখন অবস্থা এমন হবে যে, বৃক্ষ-তরুলতা এবং প্রস্তর খন্ড চিৎকার করে বলবে, হে রুহুল্লাহ! ইয়াহূদী এই আমার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। দাজ্জালের অনুগামীদের কেউ বাঁচবে না, সবাইকে হত্যা করা হবে। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত নওয়াস ইবনে সাম'আন কেলাবী দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, দাজ্জাল যখন এসব করতে থাকবে, ইতোমধ্যে আল্লাহ ইবনে মারয়ামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশ্‌কের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের কাছে দুটো হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে নামবেন। তিনি মাথা নীচু করলে পানি টপকাচ্ছে বলে মনে হবে। আবার মাথা উঁচু করলে মনে হবে যেন বিন্দু বিন্দু পানি মোতির মতো চমকাচ্ছে। তাঁর নিশ্বাস ইসলাম বিরোধি যে ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করবে, এবং এর গতি হবে তাঁর দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত

(অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতে তাঁর নিশ্বাস এতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে) সে জীবিত থাকবে না। ইবনে মার্‌য়াম দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং লুদের দ্বারপ্রান্তে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করবেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

হাদীসে লুদ নামে যে জায়গার কথা বলা হয়েছে, বর্তমানে সে জায়গা ইসরাঈলের রাজধানী তেল আবীব থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। ইহুদীরা এখানে একটি বিশাল বিমান বন্দর নির্মাণ করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেন, বলেছেন, দাজ্জাল আমার উম্মাতের মধ্যে বের হবে এবং চল্লিশ (হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না ৪০ দিন, ৪০ মাস না ৪০ বছর) অবস্থান করবে। এরপর আল্লাহ্ ঈসা ইবনে মার্‌য়ামকে পাঠাবেন। তাঁর চেহারা উরওয়া ইবনে মাসউদের (একজন সাহাবী) মতো। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। এরপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন অবস্থায় থাকবে যে, দু'জন লোকের মধ্যে শত্রুতা থাকবে না। (মুসলিম, তিরমিযী)

হযরত হুযাইফা ইবনে আসীদ আল গিফারী বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় লিপ্ত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আলোচনা করছিলে? লোকজন বললো, আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করছি। তিনি বললেন, দশটি নিশানা প্রকাশ না হবার পূর্বে তা কখনো কায়েম হবে না। এরপর তিনি দশটি নিশানা বললেন। ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়, ঈসা ইবনে মার্‌য়ামের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ, তিনটি প্রকান্ড ভূমিধ্বস একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে, আর একটি আরব উপদ্বীপে, সর্বশেষ একটি প্রকান্ড অগ্নি ইয়েমেন থেকে উঠবে এবং মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানের দিকে। (মুসলিম, আবু দাউদ)

আল্লাহর রাসূলের আজাদকৃত গোলাম হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মাতের দুটো সেনাদলকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একটি হলো, যারা হিন্দুস্তানের ওপর আক্রমণ করবে আর দ্বিতীয়টি ঈসা ইবনে মার্‌য়ামের সাথে অবস্থানকারী। (নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ)

মুজাম্মে' ইবনে জারিয়া আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ইবনে মারয়াম দাজ্জালকে লুদের দ্বারপ্রান্তে হত্যা করবেন। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক দীর্ঘ হাদীসে দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, ফজরের নামায আদায় করানোর জন্য মুসলমানদের ইমাম যখন অগ্রবর্তী হবেন, ঠিক তখনই ঈসা ইবনে মারয়াম তাদের ওপর অবতীর্ণ হবেন। ইমাম পিছনে সরে আসবেন ইবনে মারিয়ামকে অগ্রবর্তী করার জন্য কিন্তু তিনি তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলবেন, না, তুমিই নামায পড়াও। কেননা, এরা তোমার জন্যই দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তিনিই (ইমাম) নামায পড়াবেন। সালাম ফেরার পর ইবনে মারিয়াম বলবেন, দরজা খোলো। দরজা খোলা হবে। বাইরে দাজ্জাল ৭০ হাজার সশস্ত্র ইয়াহূদী সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করবে। তার দৃষ্টি ইবনে মারিয়ামের প্রতি পড়া মাত্রই সে এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে, যেমন পানিতে লবণ গলে যায় এবং সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। ইবনে মারিয়াম বলবেন, আমার কাছে তোর জন্য এমন এক আঘাত আছে যার হাত থেকে তোর কোনোক্রমেই নিষ্কৃতি নেই। এরপর তিনি তাকে লুদের পূর্ব দ্বারদেশে গিয়ে গ্রেফতার করবেন এবং আল্লাহ ইয়াহূদীদের পরাজিত করবেন এবং যমীন মুসলমানদের দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন পাত্র পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। সবাই একই কালেমায় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করা হবে না। (ইবনে মাজাহ্)

উসমান ইবনে আবিল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এবং ঈসা ইবনে মারয়াম ফজরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। মুসলমানদের নেতা তাঁকে বলবেন, হে রুহুল্লাহ! আপনি নামাজ পড়ান! তিনি জবাব দেবেন, এই উম্মাতের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের নেতা। তখন মুসলমানদের নেতা অগ্রবর্তী হয়ে নামায আদায় করাবেন। এরপর নামায আদায় করে ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন। সে যখন তাঁকে দেখবে তখন এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে যেমন সীসা গলে যায়। তিনি নিজের অস্ত্র দিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং এবং তার দলবল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। কিন্তু কোথাও তারা আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না। এমনকি বৃক্ষ ও প্রস্তর খন্ড চিৎকার করে বলবে, হে মুমিন! এখানে কাফির লুকিয়ে আছে। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সামুরা ইবেন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এরপর প্রভাতে ঈসা ইবনে মার্‌য়াম মুসলমানদের মধ্যে আসবেন এবং মহান আল্লাহ দাজ্জাল ও তার বাহিনীকে পরাজিত করবেন। এমনকি প্রাচীর এবং বৃক্ষের কান্ডও চিৎকার করে বলবে, হে মুমিন! এখানে কাফির আমার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। এসো একে হত্যা করো। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত ইমরাণ ইবনে হাসীন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মাতের ওপর মধ্যে সর্বদা একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তারা বিরোধী দলের ওপর প্রতিপত্তি করবে। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা এসে যাবে এবং ঈসা ইবনে মার্‌য়াম আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈসা ইবনে মারিয়াম অবতীর্ণ হবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি ৪০ বছর ইন্‌সাফকারী ইমাম এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহর রাসূলের আজাদকৃত গোলাম হযরত সাফীনা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহ আফিয়েকের পার্বত্য পথের কাছে তাকে (দাজ্জালকে) হত্যা করবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

হাদীসে যে আফিয়েকের কথা বলা হয়েছে সে স্থানের নাম বর্তমানে ফায়েক। সিরিয়া এবং ইসরাঈল সীমান্তে বর্তমানে সিরিয়া রাষ্ট্রের সর্বশেষ শহর। এরপরে পশ্চিমের দিকে কয়েক মাইল দূরে তাবারিয়া নামক হ্রদ আছে। এখানেই জর্দান নদীর উৎপত্তি স্থল। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহড়ের মধ্যভাগে নিম্ন ভূমিতে একটি রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তাটি প্রায় দেড় হাজার ফুট গভীরে নেমে গিয়ে সেই স্থানে পৌছায় যেখান থেকে জর্দান নদী তাবারিয়ার মধ্য হতে নির্গত হচ্ছে। এ পার্বত্য পথকেই বলা হয় আকাবায়ে আফিয়েক বা উফায়েকের নিম্ন পার্বত্য পথ।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেন, যখন মুসলমানরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবেন তখন

তাদের চোখের সম্মুখে ঈসা ইবনে মার্‌য়াম অবতীর্ণ হবেন। তিনি মুসলমানদের নামায পড়াবেন এরপর সালাম ফিরিয়ে লোকদের বলবেন, আমার এবং আল্লাহর এই দুশমনের মাঝখান থেকে সরে যাও এবং আল্লাহ্ দাজ্জালের দলবলের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয়ী করবেন। (মুস্তাদরাকে হাকিম)

হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য

এ ধরণের অনেকগুলো হাদীস রয়েছে হাদীস গ্রন্থসমূহে। এ সমস্ত হাদীস একত্রিত করতে গেলে ভিন্ন একটি গ্রন্থই রচনা করতে হয়-। যে কোনো ব্যক্তি হাদীসগুলো পড়ে নিজেই বুঝতে পারবেন যে, নতুন নবুয়্যাতের দাবীদার কাদিয়ানীদের দাবী অনুযায়ী এসব হাদীসে কোনো 'প্রতিশ্রুত মসীহ্ বা মাসীলে মসীহ্, বুরুজী মসীহ্'-এর কোনোই চিহ্ন নেই। এমন কি বর্তমানকালে কোনো পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কোনো ব্যক্তির এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মসীহ্ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, তিনিই সেই মসীহ্। পিতা ব্যতীত হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ হাদীসগুলোর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য থেকে তাঁরই অবতরণের সংবাদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঈসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেছেন না জীবিত অবস্থায় কোথাও রয়েছেন, এ আলোচনা সম্পূর্ণ অবান্তর। তর্কের খাতিরে যদি এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাহলেও বলা যায় যে, মহান আল্লাহ্ তাঁকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর এক বান্দাকে তাঁর এ বিশাল সৃষ্টি জগতের কোনো একস্থানে হাজার হাজার বছর জীবিত অবস্থায় রাখার পর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো সময় তাঁকে এই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতার প্রেক্ষিতে এ কথা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। মহান আল্লাহ তাঁর পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা সম্পর্কে সূরা বাকারার ২৫৯ আয়াতে এমন একটি ঘটনার কথা তাঁর বান্দাদেরকে শুনিয়েছেন।

বলা বাহুল্য যে ব্যক্তি হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে, তাকে অবশ্যই ভবিষ্যতে আগমনকারী ব্যক্তিকে উল্লেখিত ঈসা আলাইহিস সালাম বলে স্বীকার করতেই হবে। তবে যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে সে প্রকৃতপক্ষে কোনো আগমনকারীর অস্তিত্বই স্বীকার করতে পারে না। কারণ আগমনকারীর আগমন সম্পর্কে যে বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে হাদীস ব্যতীত আর কোথাও তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ

অদ্ভূত ব্যাপারটি শুধু এখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আগমনকারীর আগমন সম্পর্কিত ধারণা-বিশ্বাস গ্রহণ করা হচ্ছে হাদীস থেকে কিন্তু সেই হাদীসগুলোই আবার যখন সুস্পষ্ট করে এ বক্তব্য তুলে ধরছে যে, উক্ত আগমনকারী কোনো 'মসীলে মসীহ্ বা মসীহ্র ন্যায় ব্যক্তি' নন বরং তিনি হবেন স্বয়ং হযরত ঈসা ইবনে মার্‌য়াম আলাইহিস সালাম তখন তা মানতে অস্বীকার করা হচ্ছে। নিজেদের মিথ্যা বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণ করা জন্য হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে, কিন্তু নিজেদের মিথ্যা দাবীর বিপরীতে যেসব হাদীস রয়েছে, তা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী স্বয়ং স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছে–

هم خدا تعالى كى قسم كهاكر بيان كر تے هيى كه ميرے اس
دعوى كى حديث بينياد نهيے بلكه قران اور وه وحى هے جو
ميرے پر نازل هوئى، هان تائيدى طورپر هم وه حديثين پيش
كرتے هيے جو قران شريف كے مطابق هيى اور مسرى وحى ے
معارض نهى اور دوسرى حيوں كو هم ردى كيطرح پهينك
ديتے هيى، اكر حدثوں كا دنيا ميے موجود بهى نه هوتا تب
بهى ميرے اس رعوى كو كپحه جرس نه پهو نپحتا تها–

আমি খোদা তা'য়ালার শপথ করে বলছি যে, আমার এই দাবীর মূলে হাদীস নয় বরং কোরআন এবং আমার প্রতি অবতারিত ওহী। হ্যাঁ, সমর্থন লাভের জন্য আমি উক্ত হাদীসগুলো পেশ করে থাকি যেসব হাদীস কোরআনের অনুকূল ও আমার প্রতি অবতারিত ওহীর বিপরীত না হয়। এ ছাড়া আমি অন্যান্য সমস্ত হাদীস পরিত্যাজ্য বস্তুর ন্যায় ফেলে দিয়ে থাকি। যুদি পৃথিবীতে হাদীসগুলোর অস্তিত্ব না থাকতো তবুও আমার এই দাবীর কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো না। (ইযাযে আহমাদী, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। হযরত ঈসা দ্বিতীয় বার নবী হিসেবে অবতরণ করবেন না। তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি কোনো নতুন বিধান আনবেন না। আল্লাহর রাসূলের আদর্শে তিনি হ্রাস-বৃদ্ধি করবেন না। দ্বীন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্যও তাঁকে প্রেরণ করা হবে না এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনবে তাদেরকে নিয়ে একটি পৃথক উম্মাতও তিনি গড়ে তুলবেন না। তাঁকে কেবল মাত্র একটি পৃথক দায়িত্ব

দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হবে। অর্থাৎ তিনি দাজ্জালের ফিত্নাকে সমূলে বিনাশ করবেন। এ জন্য তিনি এমনভাবে অবতরণ করবেন যার ফলে তাঁর অবতরণের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। যেসব মুসলমানের মধ্যে তিনি অবতরণ করবেন তারা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারবে যে, নবী করীম্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঈসা ইবনে মার্য়াম সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি এবং রাসূলের কথা অনুযায়ী তিনি যথা সময়ে অবতরণ করেছেন। তিনি এসে মুসলমানদের দলে শামিল হবেন। মুসলমানদের তদানীন্তন নেতার পেছ্নে তিনি নামায পড়বেন।

(যদিও কতক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করার পর প্রথম নামায নিজে পড়াবেন। কিন্তু অধিকাংশ এবং বিশেষ করে শক্তিশালী কতিপয় হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি নামাযে ইমামতি করতে অস্বীকার করবেন এবং মুসলমানদের তৎকালীন ইমাম ও নেতাকে অগ্রবর্তী করবেন। মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরীনে কেরাম সর্ব সম্মতভাবে এই মতটিই গ্রহণ করেছেন)

সে সময়ে মুসলমানদের যিনি নেতৃত্ব দিবেন তিনি তাঁকেই অগ্রবর্তী করবেন যাতে এ ধরণের সন্দেহের কোনো অবকাশই না থাকে যে, তিনি নিজের নবুয়্যাতী পদমর্যাদা সহকারে পুনর্বার নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য ফিরে এসেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে কোনো দলে মহান আল্লাহর নবীর উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি ইমাম বা নেতা হতে পারেন না। সুতরাং নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের দলে তাঁর অন্তর্ভুক্ত স্বতস্ফূর্তভাবে এ কথাই ঘোষণা করবে যে, তিনি নবী হিসেবে আগমন করেননি। এ জন্য তাঁর আগমনে নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নিঃসন্দেহে তাঁর আগমন বর্তমান ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের আগমনের সাথে তুলনীয়। এ অবস্থায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ বোধ সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি সহজেই এ কথা বুঝতে পারেন যে, এক রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে অন্য একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক আগমনেই আইন ভেঙ্গে যায় না।

তবে দুটো অবস্থায় আইনের বিরুদ্ধাচরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এক, প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান এসে যদি আবার নতুন করে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন। দুই, কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও দায়িত্ব অস্বীকার করেন। কারণ এটা হবে তাঁর রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালে যেসব কাজ হয়েছিল সেগুলোর

বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর। এ দুটো অবস্থার কোনো একটি না হলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক আগমনই আইনগত অবস্থাকে কোনো প্রকারে পরিবর্তিত করতে পারে না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তাঁর নিছক আগমনেই খত্‌মে নবুয়্যাতের দুয়ার ভেঙ্গে পড়ে না। তবে তিনি এসে যদি নবীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন অথবা কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর প্রাক্তন নবুয়্যাতের মর্যাদাও অস্বীকার করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নবুয়্যাত বিধি ভেঙ্গে পড়ে।

হাদীসে এ দুটো পথই পরিপূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হাদীসে একদিকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোনো নবী নেই এবং অন্যদিকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাঁর এ দ্বিতীয় আগমন নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে হবে না। অনুরূপভাবে তাঁর আগমনে মুসলমানদের মধ্যে কুফ্‌র ও ঈমানের কোনো নতুন প্রশ্ন দেখা দেবে না। আজও কোনো ব্যক্তি তাঁর পূর্বের নবুয়্যাতের ওপর ঈমান না আনলে কাফির হয়ে যাবে। স্বয়ং আল্লাহর রাসূলও হযরত ঈসার নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সমস্ত উম্মাত শুরু থেকেই কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ওপর ঈমান রাখবে। হযরত ঈসার পুনর্বার আগমনের সময়ও এই একই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। মুসলমানরা কোনো নতুন নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান আনবে না, বরং আজকের ন্যায় সেদিনও তারা ঈসা ইবনে মারয়ামের পূর্বের নবুয়্যাতের ওপরই ঈমান রাখবে। এ অবস্থাটি বর্তমানে যেমন খত্‌মে নবুয়্যাত বিরোধী নয়, তেমনি সেদিনও বিরোধী হবে না।

আল্লামা তাফ্‌তাযানী (রাহঃ) শারহে আকায়েদে নাসাফী গ্রন্থে লিখেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী- এ কথা প্রমাণিত সত্য। যদি বলা হয়, তারপর হাদীসে হযরত ঈসার আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাহলে আমি বলবো, অবশ্যই তাঁর আগমনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবেন। কারণ তাঁর শরীয়াত বাতিল হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হবে না এবং তিনি নতুন কোনো বিধানও নির্ধারণ করবেন না। বরং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালিত করবেন। (শারহে আকায়েদে নাসাফী-১৩৫ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আলুসী (রাহঃ) তাঁর রুহুল মাআনী নামক তাফসীরে লিখেছেন, এরপর ঈসা আলাইহিস্ সালাম আগমন করবেন। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব প্রদত্ত নবুয়্যাতের

পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কারণ তিনি নিজের পূর্বের পদমর্যাদা থেকে অপসারিত হবেন না। নিজের পূর্বের আইন-কানুনের অনুসারী হবেন না। কারণ তা তাঁর নিজের ও অন্যান্য লোকদের জন্য বাতিল হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে তিনি মূলনীতি থেকে সূক্ষ্ম বিষয় পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবেন। বরং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি এবং উম্মাতের মধ্যস্থিত শাসকদের মধ্য থেকে একজন শাসক হবেন। (রুহুল মাআনী, ২২ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২)

ইমাম রাযী (রাহঃ) তাফসীরে কবীর-এ লিখেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পরে নবীদের আগমন শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে ঈসা আলাইহিস্ সালামের আগমনের পর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবেন, এ কথা কোনোক্রমেই অযৌক্তিক নয়। (তাফসীরে কবীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৩)

ইয়াহূদী দাজ্জাল ও বর্তমান পৃথিবী

সমস্ত প্রামাণ্য হাদীস থেকেই জানা যায় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যে দাজ্জালের বিশ্বব্যাপী ফিত্না নির্মূল করার জন্য পাঠানো হবে সে হবে ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত। সে নিজেকে মসীহ রূপে ঘোষণা করবে। ইয়াহূদীদের ইতিহাস ও তাদের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও বিশ্বাস সম্পর্কে অনবহিত কোনো ব্যক্তি এ বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর যখন বনী ইসরাঈল ক্রমাগত অবক্ষয় ও পতনের শিকার হতে থাকলো এমন কি অবশেষে ব্যবিলন ও আসিরিয়া অধিপতিরা তাদেরকে পরাধীন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো এবং পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত করে দিলো, তখন বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদেরকে সুসংবাদ দিতে থাকলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন মসীহ এসে তাদেরকে এ চরম লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবেন। এসব ভবিষ্যৎ বাণীর প্রেক্ষিতে ইয়াহূদীরা একজন মসীহের আগমনের প্রতীক্ষারত ছিল। তিনি হবেন বাদশাহ। তিনি যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন। বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন দেশ থেকে এনে ফিলিস্তিনে একত্রিত করবেন এবং তাদের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু তাদের এসব আশা-আকাংখাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর

পক্ষ থেকে মসীহ্ হয়ে আসলেন এবং কোনো সেনাবাহিনী ব্যতীত আগমন করলেন, তখন ইয়াহূদীরা তাকে মসীহ্ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলো। তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো।

সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইয়াহূদী জগত সেই প্রতিশ্রুত মসীহর প্রতীক্ষা করছে, যার আগমনের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সেই কাংখিত যুগের সুখ-স্বপ্ন-কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ। তালমূদ ও রাব্বীর সাহিত্য গ্রন্থসমূহে এর যে ছবি তারা অঙ্কন করেছে তার কল্পিত স্বাদ আহরণ করে শত শত বছর থেকে ইয়াহূদী জাতি জীবন ধারণ করছে। তারা বুক ভরা আশা নিয়ে বসে আছে যে, এ প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন একজন শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি নীলনদ থেকে ফেরাত নদী পর্যন্ত গোটা এলাকা ইয়াহূদীরা নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এলাকা বলে মনে করে, সে এলাকা পুনরায় ইয়াহূদীদের দখলে আনবেন এবং সারা পৃথিবী থেকে ইয়াহূদীদেরকে এনে এখানে একত্রিত করবেন।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণীর আলোকে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী ইয়াহূদীদের প্রতিশ্রুত মসীহর ভূমিকা পালনকারী প্রধানতম দাজ্জালের আগমনের জন্য মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা হয়েছে। ফিলিস্তিনের বৃহত্তর এলাকা থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে। সেখানে ইসরাঈল নামে একটি অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা এসে সেখানে বাসস্থান গড়ে তুলেছে। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স তাকে একটি বিরাট সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছে। ইয়াহূদী পুঁজিপতিদের সহায়তায় ইয়াহূদী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিগণ তাকে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গোটা পৃথিবীর বড় বড় ব্যবসা আজ ইয়াহূদীদের হাতে। এক কথায় বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে ইহুদী শক্তি। ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারী ও আবিষ্কারক তারা। জাতি সংঘকে পরিণত করা হয়েছে ইয়াহূদীদের গোলামে। জাতি সংঘ তাদের আজ্ঞাবহ দাসের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হচ্ছে। মুসলিম নামধারী নেতাদের দিয়ে ইয়াহূদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর জন্য ইহুদীদের অস্ত্র ভান্ডার এক মহাবিপদে পরিণত করেছে।

যেসব মুসলিম দেশ ভবিষ্যতে ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে, জাতি সংঘের মাধ্যমে সেসব মুসলিম দেশের সামরিক শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিমদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য ইয়াহূদীরা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে যে কোনো সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ইয়াহূদী রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ তাদের ধর্মীয় কল্পনার ফানুস 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশ' দখল করার আকাংখা মোটেও গোপন না রেখে প্রকাশ করে দিয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো মুসলিম দেশে তারা যখন তখন হামলা পরিচালনা করছে। দীর্ঘকাল থেকে ভবিষ্যতে ইয়াহূদী রাষ্ট্রের যে নীল নক্শা তারা প্রকাশ করে আসছে তাতে করে গোটা মধ্যপ্রাচ্যই তাদের দখলে তারা নিয়ে নেবে। তাদের ধর্মীয় নক্শায় রয়েছে সিরিয়া, লেবানন, জর্দানের সমগ্র এলাকা, ইরাক, তুরস্কের ইস্কান্দারুন, মিশরের সিনাই ও ব-দ্বীপ এলাকা এবং মদীনাসহ আরবের অন্তরগত হিজায ও নজদের উচ্চভূমি পর্যন্ত তারা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করার ধর্মীয় আদেশ বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এসব কাজে ইয়াহূদীরা স্বঘোষিত বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা ও তার পোষ্য বৃটেন এবং অন্যান্য খৃষ্টান ও অমুসলিম দেশসমূহকে ব্যবহার করছে। নিজেরা আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী এর যাবতীয় সম্পদ আটক করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তারা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে আফগানিস্থান ও ইরাককে দখল করে ইরান ও সিরিয়া দখল করার পথে অগ্রসর হচ্ছে। মুসলমানরা যেন আত্মরক্ষার মত কোনো অস্ত্র রাখতে না পারে, সে ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইয়াহূদীদের এসব কার্যক্রমে মুসলিম নামধারী সরকারসমূহ রোবটের ন্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আগামীতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে অথবা বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তারা ঐসব এলাকা দখল করার চেষ্টা অবশ্যই করবে এবং কথিত প্রধানতম দাজ্জাল তাদের প্রতিশ্রুত মসীহরূপে আগমন করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তার আগমন সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং সেই সাথে একথাও বলেছেন যে, সে সময় মুসলমানদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে এবং এক একটি দিন তাদের কাছে এক একটি বছর বলে

প্রতীয়মান হবে। এ জন্য তিনি নিজে মসীহ্ দাজ্জালের ফিত্না থেকে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চেয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এই মসীহ্ দাজ্জালের মোকাবিলা করে তার ঘৃণ্য গতিরোধ করার জন্য মহান আল্লাহ কোনো মসীলে মসীহ্কে প্রেরণ করবেন না বা প্রেরণ করেননি। বরং মহান আল্লাহ প্রকৃত মসীহ্ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করবেন। ইয়াহূদীরা সে সময়ে যে প্রকৃত মসীহ্ হযরত ঈসাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং তাদের জানা মতে তারা তাঁকে শূলবিদ্ধ করে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই প্রকৃত মসীহ্ ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক গ্রামে অথবা আফ্রিকায় বা আমেরিকায় অবতরণ করবেন না, বরং তিনি অবতরণ করবেন দামেশ্কে। কারণ তখন সেখানেই মুসলমানদের সাথে ইয়াহূদীদের যুদ্ধ চলতে থাকবে। আর ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল থেকে দামেশ্ক মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু থেকে সহজেই একথা বোধগম্য হয় যে, মসীহ্ দাজ্জাল ৭০ হাজার ইয়াহূদী সেনাদল নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে এবং দামেশ্কের সামনে উপস্থিত হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে দামেশ্কের পূর্ব অংশের একটি সাদা মিনারের কাছে সুবৃহে সাদিকের পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং ফজর নামায শেষে মুসলমানদেরকে নিয়ে দাজ্জালের মোকাবিলায় বের হবেন। তাঁর প্রচন্ড আক্রমনে দাজ্জাল পশ্চাদপসরণ করে আফিয়েকের পার্বত্য পথ দিয়ে ইসরাঈলের দিকে ফিরে যাবে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পিছু না হটে তার পেছনেই যেতে থাকবেন। অবশেষে লিড্ডা বিমান বন্দরে দাজ্জাল হযরত ঈসার হাতে নিহত হবে। এরপর ইয়াহূদীদেরকে প্রতিটি স্থান থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করা হবে ফলে ইয়াহূদী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে সত্য প্রকাশের পর খৃষ্টান ধর্মও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সমস্ত মিল্লাত একীভূত হয়ে যাবে।

এসব হাদীসের একস্থানে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন বর্শা দিয়ে। আর দাজ্জাল হলো একজন ইয়াহূদী . পক্ষান্তরে বর্তমান পৃথিবীতে ইয়াহূদীরাই হলো সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের অধিকারী। ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের

আবিষ্কারকও তারা। ভবিষ্যতে তারা আরো ধ্বংসাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করবে। তাহলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তরবারী আর বর্শা দিয়ে কিভাবে কম্পিউটারাইজড মারণাস্ত্রের মোকাবিলা করবেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, দুটো বিশ্বযুদ্ধে বর্তমানে আবিষ্কৃত মারণাস্ত্রের ধ্বংস যজ্ঞ দেখে মানুষ এতটাই ভীতগ্রস্থ যে, গোটা পৃথিবী জুড়ে চিৎকার করা হচ্ছে 'অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি করতে হবে।' যে কথাটা মাত্র এক শতাব্দী পূর্বেও কল্পনা করা যায়নি। তৃতীয় বা চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের বিভিষীকা দেখে এই মানুষই চিৎকার করে 'অস্ত্র নির্মূলকরণ' চুক্তির জন্য দাবী করতে থাকবে। অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী এক সময় আধুনিক মারণাস্ত্রের তান্ডব থেকে মুক্তি লাভ করবে। তখন যদি কারো সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে সেই সাবেক আমলের তরবারী আর বর্শা ব্যতীত যুদ্ধের উপকরণ তো আর থাকবে না। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালাম তরবারী বর্শা দিয়ে যে যুদ্ধ করবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মহান আল্লাহ সে সময়ে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম। প্রকৃত সত্য মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

কাদিয়ানী কর্তৃক মসীহের নামে প্রতারণা

সামান্যতম সন্দেহ, সংশয়, জড়তা ও অস্পষ্টতা ব্যতীতই এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও চরম সত্য হাদীস থেকে ফুটে উঠেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষনবী এবং তাঁর পরে আর কোনো নতুন নবীর আগমন ঘটবে না। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কেউ যদি নবী হওয়ার দাবী করে এবং যারা তার অনুসারী ও সমর্থক হবে, তারা অবশ্যই অমুসলিম হিসেবে পরিগণিত হবে। সেই সাথে এই সুদীর্ঘ আলোচনার পর এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, প্রতিশ্রুত মসীহর নামে কাদিয়ানী গোষ্ঠী কর্তৃক যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে, তা একটি বড় ধরণের প্রতারণা ও জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের এই প্রতারণার সবচেয়ে হাস্যকর দিকটি হলো, যে অভিশপ্ত ব্যক্তি নিজেকে হাদীসে উল্লেখিত মসীহ বলে দাবী করেছে, সেই গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী নিজেই তার লিখিত পুস্তকে নিজেকে ঈসা ইবনে মারয়াম হওয়ার দাবী করে এক অদ্ভুত গল্প ফেঁদেছে। সে লিখেছে-'তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) বারাহীনে আহমাদীয়ার তৃতীয় অংশে আমার নাম রেখেছেন মারয়াম। এরপর যেমন বারাহীনে আহমাদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, দু'বছর পর্যন্ত আমি মারয়ামের গুণাবলী সহকারে লালিত হই, এরপর

মার্‌য়ামের ন্যায় ঈসার রুহ আমার মধ্যে ফূঁৎকারে প্রবেশ করানো হয় এবং রূপকার্থে আমাকে গর্ভবতী করা হয়। কয়েকমাস পরে, যা দশ মাসের চেয়ে বেশী হবে না, সেই এলহামের মাধ্যমে, যা বারাহীনে আহমাদীয়ার চতুর্থ অংশে উল্লেখিত হয়েছে, আমাকে মার্‌য়াম থেকে ঈসায় পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং এভাবে আমি হলাম ঈসা ইবনে মার্‌য়াম।' (কিশ্‌তীয়ে নূহ, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮-৮৯)

এই অভিশপ্ত লোকটির বক্তব্য অনুসারে প্রথমে সে মরিয়াম হলো তারপর নিজে নিজেই গর্ভবতী হলো। তারপর নিজের পেট থেকে নিজেই ঈসা ইবনে মার্‌য়াম রূপে জন্ম গ্রহণ করলো। তার এ বক্তব্য যে কতটা বালখিল্য, তা একটি শিশুও অনুভব করতে পারে। পবিত্র হাদীসের বক্তব্য অনুসারে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন দামেশ্‌কে। দামেশ্‌ক কয়েক হাজার বছর থেকে সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পরিচিত শহর। পৃথিবীর মানচিত্রে আজও এই শহরটি এই নামেই চিহ্নিত। ঈসা মসীহ হবার দাবীদার দেখলো যে, তার জন্ম যেহেতু কাদিয়ান নামক গ্রামে। আর সত্যিকারের ঈসা আলাইহিস সালামের আসার কথা হাদীসে বলা হয়েছে দামেশ্‌কে। এই জালিম তখন কাদিয়ানকেই দামেশ্‌ক শহর বানিয়ে ছাড়লো। সে লিখেছে, 'উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দামেশ্‌ক শব্দের অর্থ আমার কাছে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ স্থানে এমন একটি শহরের নাম দামেশ্‌ক রাখা হয়েছে যেখানে এজিদের স্বভাব সম্পন্ন ও অপবিত্র এজিদের অভ্যাস ও চিন্তার অনুসারী লোকদের বাস। এই কাদিয়ান শহরটি এখানকার অধিকাংশ এজিদী স্বভাব সম্পন্ন লোকের অধিবাসের কারণে দামেশ্‌কের সাথে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক রাখে।' (এযালায়ে আওহাম, ফুটনোট, ৬৩-৭৩)

এরপরও এই প্রতারক মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী লা'নাতুল্লাহি আলাইহির সামনে সমস্যা দেখা দিল সাদা মিনারের। হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ঈসা ইবনে মার্‌য়াম একটি সাদা মিনারের কাছে অবতরণ করবেন। এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এভাবে যে, প্রতারক এই লোক নিজেই তার গ্রামে একটি সাদা মিনার বানিয়ে দেখিয়েছে যে, হাদীসের বক্তব্য অনুসারে সেই হলো ঈসা মসীহ।

এই অভিশপ্ত জাহান্নামীকে কে বুঝাবে যে, হাদীসের বর্ণনা অনুসারে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসার পূর্বেই দামেশ্‌কে সাদা মিনার মওজুদ থাকবে। হাদীসে

বলা হয়েছে, হযরত ঈসা লিড্ডায় প্রবেশ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সম্পর্কে গোলাম আহমাদ নানা ধরণের ভিত্তিহীন গল্প ফেঁদেছে। কখনো সে লিখেছে, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি গ্রামের নাম হলো লিড্ডা। (এযালায়ে আওহাম, আন্‌জুমানে আহমদীয়া, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত, ক্ষুদ্রাকার, ২২০ পৃষ্ঠা)

আবার কখনো সে লিখেছে, লিড্ডা শব্দের অর্থ হলো, এমন সব লোক যারা অনর্থক ঝগড়া করে। যখন দাজ্জালের অনর্থক ঝগড়া চরমে পৌছবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব হবে এবং ঝগড়া শেষ করে দেবে। (এযালায়ে আওহাম, ৭৩০ পৃষ্ঠা)

আবার সে লিখেছে, লিড্ডা বা লুদ মানে হলো ভারতের এই পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহর। আর লুধিয়ানার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করার অর্থ হলো, দুষ্টদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মীর্জা গোলাম আহমাদের হাতে এখানেই সর্বপ্রথম বাইয়াত হয়। (আলহুদা, ৯১)

নবুয়্যাতের দাবীদার এই অভিশপ্ত কাদিয়ানী গোষ্ঠী ইসলাম বিরোধী অমুসলিমদের সাহায্য সহযোগিতায় পরিপুষ্ট হয়েছে এবং পৃথিবীতে মুসলমানদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য তারা প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই তাদের অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। কোনো কোনো দেশে তারা মুসলিম নামধারী সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে। অবশ্য গোটা বিশ্বের সমস্ত আলিম-উলামা, মাশায়েখ এদেরকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কতক দেশে মুসলিম জনতার দাবীর মুখে সরকার তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের জন্য মক্কা ও মদীনায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরা ইসলামের পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানদেরকে যেভাবে ধোকা দিচ্ছে, এর মোকাবিলায় মুসলমানদের জিহাদী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সরকারীভাবে অবশ্যই কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে ওআইসি-এর ফতোয়া

ওআইসি'র অধীন বিশ্ব ফিকাহ্ একাডেমী, বিশ্ব মুসলিম লীগ ও বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ১৯৭৪ সালে বিশ্বের ১৪৪টি রাষ্ট্রের ফিকাহ্বিদগণ পবিত্র মক্কায় রাবিতা আলম আল ইসলামীর উদ্যোগে সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছে এবং সকল মুসলিম দেশকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। এ কারণে অনেক মুসলিম দেশই তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এ সম্মেলনে কাদিয়ানীদের সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব পাস করা হয়। সে প্রস্তাবগুলো হলো–'কাদিয়ানীয়াত' একটি বাতিল ধর্ম। নিজেদের কলুষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কাদিয়ানীরা মুসলমানদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এরা ইসলামের ভিত্তিসমূহকে ধূলিসাৎ করে দিতে চায়। এরা ইসলামের দুশমন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মীর্জা গোলাম আহমাদ নিজেকে নবী দাবী করেছে। কোরআনের আয়াতসমূহ বিকৃতি করেছে। জিহাদের বিধান বাতিল হওয়ার ফতোয়া দিয়েছে। তারা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন এবং মূলোৎপাটন করার জন্য বিভিন্ন পন্থায় তৎপর রয়েছে। ইসলামের শত্রু-শক্তির সহায়তায় মসজিদের নামে মুরতাদদের আড্ডাখানা তৈরী করে যাচ্ছে। মাদ্রাসা, স্কুল, এতিমখানা এবং সাহায্য শিবিরের নামে অমুসলিম শক্তির সহায়তায় নিজেদের বিকৃত উদ্দেশ্য সাধন করছে। দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের বিকৃত সংস্কারণগুলোর প্রচার করছে ইত্যাদি। তাদের এসব কার্যকলাপকে সামনে রেখে সম্মেলনে প্রস্তাব পাস করে–

(১) বিশ্বব্যাপী ইসলামী সংগঠনগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে-তারা যেন কাদিয়ানীদের ইবাদাতখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা এবং অন্যান্য যেসব এলাকায় তারা রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এদের ছড়ানো ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বাঁচার জন্য ইসলামী দুনিয়ার সামনে পূর্ণাঙ্গভাবে কাদিয়নীদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।

(২) এ সম্প্রদায় কাফির এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত (মুরতাদ) হওয়ার কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। এ জন্যই তাদেরকে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

(৩) মুসলমানগণ কাদিয়ানীদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে বয়কট করতে হবে। তাদের মরদেহ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে দেয়া যাবে না।

(৪) এ সম্মেলন সকল মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে এ দাবী করছে যে, নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবীদার ভন্ড মীর্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর অনুসারীদের যে কোনো প্রকারের তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক এবং তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হোক। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদসমূহে তাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

(৫) কাদিয়ানীরা কোরআন মজিদে যে বিকৃতি করেছে, এর চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। এদের অনূদিত কোরআনের কপিগুলো সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করতে হবে এবং এসব অনুবাদের প্রচার বন্ধ করে দিতে হবে।

এসব প্রস্তাব পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বসহ বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। দিল্লীর সাপ্তাহিক 'আল-জমিয়াত' (২৯ এপ্রিল, ১৯৭৪), কলিকাতার উর্দু দৈনিক 'আসরে জাদীদ' (৯ মার্চ, ১৯৭৫), কাদিয়ানের সাপ্তাহিক 'বদর' (৯ মে, ১৯৭৪) প্রভৃতি ভারতীয় পত্রিকাতেও এ প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে সারা বিশ্বের আলিম-উলামাদের ফতোয়া

১৯৩৫ সালে তুর্কী ওলামায়ে কেরাম একযোগে কাদিয়ানীদের অমুসলিম-মুরতাদ ঘোষণা দেন। তখন সে দেশে একজন কাদিয়ানীকে ফাঁসি দেয়া হয়। ১৩৯৭, ১৩৯৮ এবং ১৩৯৯ হিজরী সনে মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম মসজিদ পরিষদ-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক কাউন্সিল সভায় কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কাদিয়ানীদের দ্বারা পবিত্র কোরআন-হাদীসের বিকৃত অর্থকরণ এবং এর অপপ্রচার ও অপপ্রয়োগ, বিশ্বব্যাপী ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের প্রতি তাদের সহযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম বিরোধী শক্তির সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর কাদিয়ানীদেরকে 'অমুসলিম-কাফির' বলে ঘোষণা করা হয়।

ইসলামী জ্ঞানের পীঠস্থান আল-আজহারের ফতোয়া বিভাগ মুসলিম উম্মাহ্র সর্বসম্মত ইজমা অনুসারে আহমাদী কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম-কাফির' ইসলাম হতে বহির্ভূত বলে ঘোষণা দিয়েছে।

সউদী আরবের মদীনা শরীফে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ফতোয়া বিভাগ ১৯৬৬ সালে কোরআন-হাদীসের আলোকে প্রমাণ করে যে, কাদিয়ানী ধর্মের প্রবর্তক মীর্জা গোলাম আহমাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকরী। সুতরাং গোলাম আহমাদ ও তার অনুসারীরা কাফির, ইসলাম হতে খারিজ।

বিশ্ব মুসলিম যুব সংসদ, ইসলামিক গবেষণা, ইফতা ও প্রচার সংস্থা এবং ইসলামিক ছাত্র সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক ফেডারেশন কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের জঘন্য নিন্দা করেছে। এসব সংস্থা কাদিয়ানীদেরকে ইসলাম বহির্ভূত বলে ঘোষণা দিয়েছে। এদেশের সর্বশ্রেণীর আলিম-উলামা, হক্কানী পীর-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, ফিকাহ্‌বিদ ও শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী বাতিল ধর্ম প্রচার ধরা পড়ার পর থেকে তারা ব্যক্তিগতভাবে এবং দলবদ্ধভাবে এর বিরোধিতা করেন এবং কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম-কাফির বলে ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের তৌহিদী জনতা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা দিয়েছে। দেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এদেশের কাদিয়ানীদেরকে অন্যান্য দেশের মত আইনগত ও শাসনতান্ত্রিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য তারা সরকারের কাছে আবেদন করেছে এবং তজ্জন্য আন্দোলন করছে। ১৯২৩ সালে দিল্লীতে সর্বভারতীয় উলামা সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর অধিবেশনে ভারতের সকল প্রদেশের আলিম-উলামার উপস্থিতিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের আক্বীদা-বিশ্বাস ইসলাম বহির্ভূত। সুতরাং আহমাদী জামাতের অনুসারীরা কাফির।

১৯২৫ সালে আহলে হাদীসের অমৃতসর কেন্দ্র হতে একটি ফতোয়া 'ফসখে নিকাহে মির্যাই' নামে প্রচারিত হয়। এতে অবিভক্ত ভারতের সকল শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের স্বাক্ষর রয়েছে। সকলে একবাক্যে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম, কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

১৯১২ সনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, আল কালুছ ছহি ফী আকায়িদিল মসীহ নামের পুস্তকটিতে তদানীন্তন ভারতের প্রতিটি প্রদেশ ও জেলার শত শত আলিমের দরখাস্ত রয়েছে। এতে সকল আলিমই সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ও কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

১৩৪১ হিজরীর সফর মাসে দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকগণ ফতোয়া দেন যে, কাদিয়ানীরা মুরতাদ, ঝিন্দীক, মুলহিদ ও কাফির। মীর্জা কাদিয়ানীর জীবদ্দশাতেই দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কুতুবে আলম মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (১৮২৮-১৯০৫)-এর নেতৃত্বে ভারতের অনেক আলিম বুযুর্গ ব্যক্তিগণ গোলাম আহমাদকে কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

মিসরের আলিমদের প্রতিনিধি মুফতী-এ-আজম শায়খ মুহাম্মদ হাসনাইন মাখলুফের নেতৃত্বে মিসরীয় উলামা সমাজ মীর্জা গোলাম আহমাদের আক্বীদা অনুযায়ী সকল কাদিয়ানী দলের কাফির হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন। সিরিয়ার উলামাদের প্রতিনিধি মুফতী-এ-আজম ফতোয়া দেন যে, কাদিয়ানীরা শর্তহীনভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষনবী মানে না, তাই তারা কোরআন অস্বীকারকারী ও ইসলামী আকীদা অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা অমুসলিম কাফির।

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত

আফগানিস্তানে সরকারীভাবে কাদিয়ানীদেরকে মুরতাদ ও হত্যাযোগ্য বলে আদেশ জারি করা হয়েছে। তারা বহু পূর্বে ১৯৯৯ সালেই কাদিয়ানীদের প্রতি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। সে দেশে কাদিয়ানী ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সউদী আরব সরকারের ইসলামী গবেষণা, ইফতা, দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম-কাফির বলে সিদ্ধান্ত জারি করেছে। ১৯৫৭ সালে সিরিয়া সরকার কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে সে দেশে তাদের প্রচার বন্ধ করে দেয়। ১৯৫৮ সালে মিসরীয় সরকার আল-আজহারের ফতোয়া অনুসারে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ও ইসলাম বহির্ভূত একটি বাতিল ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা দেয়।

১৯৭৩ সালে আজাদ কাশ্মীর সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে একটি বিল পাস করে। প্রেসিডেন্ট সরকার আব্দুল কাউয়ুম খান সে বিলে সম্মতি দিলে তা আইনে পরিণত হয়।

১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ, 'জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম'-এর তৎকালীন সংসদীয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী মাওলানা মুফতী মাহমুদ সাহেবের নেতৃত্বে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ

মাসব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর এবং কাদিয়ানীদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার পূর্ণ সুযোগ দিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কাদিয়ানীরা কাফির ও ইসলাম বহির্ভূত। সে অনুসারে পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধন করা হয়। এতে তাদেরকে খৃষ্টান ও হিন্দুদের মত অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়া হয়।

মালয়েশিয়ার 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক এফেয়ার্স' (সরকারী সংস্থা) কাদিয়ানীদের সম্পর্কে Qadiani Teachings নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকার ৩য় পৃষ্ঠায় ঘোষণা করা হয়েছে– কাদিয়ানী/আহমাদী সম্প্রদায় ইসলাম বহির্ভূত একটি সম্প্রদায়। অতএব তারা মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট পরিভাষা ও অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারবে না এবং তাদের লাশ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে পারবে না।

বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ ইন্দোনেশিয়া কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলে বিবেচনা করেছে। সেখানে অমুসলিম ধর্মের প্রচার নিয়ন্ত্রিত করে একটি আদেশ জারি করা হযেছে। সে আদেশের অধীনে কাদিয়ানী ও খৃস্টানরা মুসলিমদের নিকট তাদের ধর্ম প্রচার করতে পারে না। **ওআইসি'র অন্যতম সদস্য নাইজেরিয়া আফ্রিকার বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। সে দেশ হতে সউদী আরব গমনের সময় ভ্রমণকারীকে অবশ্যই 'অ-আহমাদী সনদ' সংগ্রহ করে সাথে বহন করতে হয়। দেশী-বিদেশী সমস্ত পর্যটকই এ নিয়মের অধীনে সরকারের নিকট হতে এ সনদ সংগ্রহ করে থাকে। কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বিবেচনা করেই সরকার তাদেরকে সউদী আরব বিশেষতঃ মক্কা-মদীনা শরীফাইনে যেতে দেয়া হয় না।**

মুসলিম দেশ তুরস্কে কাদিয়ানী ধর্ম প্রচারিত হওয়াতে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মুসলিম ও কাদিয়ানীদের মধ্যে যে কোনো প্রকারের সহিংসতা ও ভুল বোঝাবুঝির অবসানকল্পে সরকার কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত বহুদিন যাবৎ বৃটিশ কলোনী থাকার কারণে কাদিয়ানীরা এখানে তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ পায়। খত্‌মে নবুয়্যাতের চরম শত্রু এ দলটি বাতিল ধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত থাকায় সরকার এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ঘোষণাতে বলা হয়, এরা এত সূক্ষ্মভাবে ও গোপনে তাদের মতবাদ পোষণ করে যে, অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এদেরকে মুসলিম হিসেবে ভুল হয়। কারণ, এদের নাম, লেবাস, বিয়ে, খাদ্যবস্তু সবকিছুই মুসলমানদের অনুরূপ। তাই এদেরকে অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে এ সরকারী ঘোষণা জারি করা হলো।

গাম্বিয়ার রাজধানী বানজুল থেকে সম্প্রতি গাম্বিয়ান সরকার কর্তৃক কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সরকারী নির্দেশে বলা হয় যে, সে দেশে কাদিয়ানীরা ইসলাম বিরোধী অনৈতিক কার্যকলাপ এতটা বাড়িয়ে দিয়েছে যাতে মুসলিম সমাজে প্রচন্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কাদিয়ানীরা মুসলিম সমাজকে ইসলামের নীতি-পরিপন্থী বিপথে আহ্বান করছিল। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রেক্ষিতে সরকার তাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

১৯৫৩ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী লাহোরে খতমে নবুয়্যাতের মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য সামরিক আইন লংঘন করে অসংখ্য মুসলমান শাহাদাত বরণ করে প্রমাণ করেন যে, আক্বীদায়ে খত্‌মে নবুয়্যাতের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম। এরপর ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তাকে সমূলে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবী ও আন্দোলন চলতেই থাকে। এ সময়ের মধ্যে সচেতন মুসলমানরা তাদের আসল রূপ চিনতে সক্ষম হয়। ফলে অধিকাংশ মুসলিম দেশ তাদেরকে মুরতাদ-কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছে এবং তাদের কর্মকান্ড ও প্রচারণা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ কাদিয়ানীদেরকে অমুলিম ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ-খৃষ্টান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে পার্থক্য

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে সারা পৃথিবীতে এই দেশের সুনাম অক্ষুন্ন রয়েছে এবং আল্লাহর রহমতে আগামীতেও থাকবে। এদেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করেন, মুসলমানদের সাথে একত্রে মিলেমিশে পাশাপাশি বসবাস করেন এবং দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তারা অবদান রাখছেন। কর্মক্ষেত্রে কোথাও তাদের প্রতি কোনো বৈষম্য করা হয় না। এদেশে বসবাসরত হিন্দু-বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের আমরা চিনি। তারা কখনো কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের ধর্মমত মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন না। দেশের একজন মুসলমান নাগরিক যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ

করে থাকে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান নাগরিকও সেই একই সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। মুসলমানদের সাথে তাদের কোনো বিরোধ নেই। কারণ তারা নিজেদের পরিচয় গোপন করে না বা ইসলামের ছদ্মাবরণে মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করে না।

পক্ষান্তরে কাদিয়ানী গোষ্ঠী তাদের ধর্ম বিশ্বাস গোপন করে, মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলামের ছদ্মাবরণে মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে দিচ্ছে। সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে চিনতে পারে না বিধায় তারা সহজেই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। কাদিয়ানীরা মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিনষ্ট করছে। তাদের সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এখানেই পার্থক্য এবং এই পার্থক্যের কারণেই মুসলমানদের দাবী হলো, তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করতে হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুরূপ তারাও যদি নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে বাংলাদেশে বসবাস করে তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এদেশে মুসলমানদের ন্যায় যে নাগরিক সুবিধা ভোগ করে থাকে, কাদিয়ানীরাও তাই ভোগ করবে। কিন্তু মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলামী লেবাস পরিধান করে ইসলামের গোড়া কাটার চেষ্টা করবে, এটা এদেশের তওহীদী জনতা প্রাণ থাকতে বরদাসৃত করবে না। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যেভাবে এদেশে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করছে, কাদিয়ানীরা ঠিক তাই করতে পারে। তখন কেউ তাদের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করবে না, তাদের ধর্ম পালনে কেউ কোনো হস্তক্ষেপও করবে না। কাদিয়ানীরা মুসলিম দাবী করলে মির্জা গোলাম আহমাদকে অস্বীকার করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষনবী মেনে নিতে হবে অথবা অমুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে বাস করতে হবে।

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা

১৯৫২ সালে কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গার পর লাহোরে মামলা চলাকালে মুসলমানদের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে মামলা পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শ মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাকে মামলার খরচ গ্রহণ করার অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, **'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত লাভের জন্য এ কাজও তো ওসীলা হতে পারে। আমি**

কোনো জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করার জন্য এই মামলা পরিচালনা করছি না।' মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান খত্মে নবুয়্যাত আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করার পর হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় কাদিয়ানী প্রসঙ্গে মুফতি মাহমুদ (রাহঃ)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, **কাদিয়ানীরা যে মুসলমান নয়, এটা আমার ছাত্রজীবন থেকেই জানা। আমার নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করে আমাদের জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন, আমরা তা থেকে বিচ্যুত হবো না। সুতরাং এ থেকে আপনারা ধরে নিতে পারেন যে, কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে আমরাও আপনাদের সাথে রয়েছি। কাদিয়ানীরা কখনোই মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না।** (কাদিয়ানী ধর্মমত-৯৩ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে বাংলাদেশ হাইকোর্টের মতামত

কাদিয়ানীদের রচিত 'ইসলামে নবুয়্যাত' নামক গ্রন্থটি বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৫ সালে আপত্তিকর বিবেচনা করে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কাদিয়ানীরা সরকারী এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করে। এই মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্টে ডিভিশনের বিচারপতি সুলতান হোসেন খান ও বিচারপতি এ, এম, মাহমুদুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ তাঁদের রায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোনো নতুন নবী আগমনের দাবীকে ভ্রান্ত ও কুফ্রী বিশ্বাস বলে অভিহিত করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন আদালতের রায়ে কাদিয়ানীরা যে অমুসলিম ঘোষিত হয়েছে, সে প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। ১৯৯৩ সালেও কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আরেকটি মামলায় হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি মুহাম্মাদ আব্দুল জলিল ও বিচারপতি মুহাম্মাদ ফজলুল করীম-এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম হিসেবে রায় ঘোষণা করেন। বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার কাদিয়ানীদের যাবতীয় প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর কাদিয়ানীরা উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়। পক্ষান্তরে আদালত তাদের দাবী বাতিল করে দেন।

বাংলাদেশের সংবিধান ও কাদিয়ানী গোষ্ঠী

বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে বলা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।' সুতরাং সংবিধান অনুসারে ইসলাম হলো রাষ্ট্রধর্ম এবং সরকারী যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হবে মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা সহকারে। পক্ষান্তরে কাদিয়ানী গোষ্ঠী ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী একটি সম্প্রদায় বিশেষ। আর এই সংবিধান প্রণেতা ও সংশোধকদের কেউ-ই কাদিয়ানী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না বিধায় একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সংবিধানে ইসলাম বলতে আল্লাহর কোরআন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্কেই বুঝানো হয়েছে। অতএব যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত কথাগুলো অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোরআন-সুন্নাহ্কে বিকৃত করে পেশ করার কোনো অবকাশ কারো নেই। শুধু তাই নয়, **দেশের সংবিধান অনুসারে ইসলামকে কটাক্ষ করে বা হেয় প্রতিপন্ন করে বক্তৃতা, বিবৃতি, গ্রন্থ রচনা বা প্রবন্ধ রচনা করার অধিকারও কারো নেই। কেউ যদি তা করে তাহলে তা হবে নিঃসন্দেহে সংবিধান লংঘনের শামিল।**

কিন্তু অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কাদিয়ানী গোষ্ঠী প্রত্যেক পদক্ষেপে বাংলাদেশের সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি প্রদর্শন করে আল্লাহ, রাসূল, মুসলমান ও ইসলামকে অপমান করে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি যেনার অপবাদ দিয়েছে, নিজেদের ধর্মীয় কিতাবকে কোরআনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেছে, রাসূলের হাদীসকে মিথ্যা বলেছে, খত্মে নবুয়্যাত অস্বীকার করে নবী দাবী করেছে এবং সর্বোপরি মুসলমানদেরকে তারা কাফির ঘোষণা করেছে। এরপরও দেশের পরিচালকগণ তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান লংঘনের কোনো অভিযোগ আনেনি। সুতরাং সরকারের উচিত, দেশের স্বার্থে, সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার্থে অবিলম্বে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আদালতে সংবিধান লংঘনের অভিযোগ দায়ের করে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা।

কতিপয় চিহ্নিত গোষ্ঠী কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করাকে সংবিধান বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ইত্যাদি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আমদের প্রশ্ন, ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে, বাক

স্বাধীনতার নামে কোনো ধর্মের মূল বিষয়কে পরিবর্তনের অধিকার কি কেউ দাবী করতে পারে? একজন ব্যক্তি খত্‌মে নবুয়্যাতকে অস্বীকার করে নিজেকে নবী দাবী করবে এবং তার ভ্রান্ত ও কুফ্‌রী আকিদা-বিশ্বাস অনুসারে নতুন সম্প্রদায় গঠন করবে আবার মুসলমানও থাকতে চাইবে- এটি কি আমাদের সংবিধান অনুমোদন করে? নতুন কোনো ধর্ম কেউ প্রচার করলে করতে পারেন; কিন্তু একটি নতুন ধর্মকে ইসলাম বলে চালিয়ে দেয়ার কি কোনো অধিকার বাংলাদেশের সংবিধান দিয়েছে? ইসলামের নামে ইসলামের পরিভাষা ব্যবহার করে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ই সংবিধান লংঘন করছে। ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের বিরোধিতা করা হবে আবার তার অনুসারীও দাবী করা হবে– এটা কোন্ ধরণের অধিকার? পৃথিবীর কোনো ধর্ম ও সংবিধানের দোহাই দিয়ে কি এ ধরণের অধিকার ভোগ করা যাবে?

মানবাধিকার লংঘনের ভিত্তিহীন অভিযোগ

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংবিধান স্বীকৃত এ অধিকার রয়েছে যে, সে তার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব হচ্ছে, তার অধিকার নিশ্চিত করা। ইসলামও অন্য ধর্মাবলম্বীর এই অধিকার নিশ্চিত করেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্ম চর্চার অধিকার দিয়েছে, কিন্তু এক ধর্মাবলম্বী হয়ে অন্য ধর্মের নামধারণ করা এবং ঐ ধর্মের সাধারণ লোকদের সাথে প্রতারণা করার অধিকার দেয়া হয়নি। **একজন লোক বা একটি সম্প্রদায় অমুসলিম হয়ে ইসলামের নাম ব্যবহার করবে, নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেবে, এর নাম ধর্মীয় অধিকার নয়। এটা অন্যের অধিকারে সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপ। কোনো ধর্ম বা সে ধর্মের স্বাধীনতা মানে এই নয় যে, ইসলাম ধর্মের মূলনীতি ও বিশ্বাস পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হবে, মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সে ধর্মের লোকদের বিভ্রান্ত করা হবে এবং মুসলমানদের সমান্তরাল সম্প্রদায় গঠন করা হবে। এগুলো ধর্মীয় স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতার নামে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর হস্তক্ষেপমাত্র- যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।**

মুসলমানরা কাদিয়ানীদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচর্চায় বাধা দিচ্ছে না; বরং কাদিয়ানী গোষ্ঠী কর্তৃক মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় আদর্শ ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা রোধ করার আন্দোলন করছে। কাদিয়ানী ধর্মের অনুসারীরা যদি নিজেদের ধর্মকে ইসলাম না বলে এবং নিজদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় না দেয় তাহলে সমস্যার সমাধান

হয়ে যায় এবং কোনো আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাও আর থাকবে না। সুতরাং যারা কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করাকে মানবাধিকার লংঘন বলে মন্তব্য করছেন, হয় তারা জেনে বুঝে নিজেদের স্বার্থে কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করছেন, না হয় তারা অজ্ঞতার কারণেই মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। **আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মূল কথাই হলো, নিজের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা বা অধিকার ও স্বাধীনতার নামে কেউ অন্যের অধিকার, স্বাধীনতা ও আকিদা-বিশ্বাসের ওপর আঘাত করতে পারবে না। বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মৌলিক মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারের মূলনীতি অনুযায়ী কারো আকিদা-বিশ্বাসের ওপর আঘাত করার অধিকার কারো নেই। কিন্তু কাদিয়ানী গোষ্ঠী বাংলাদেশের ১৪ কোটি মুসলমানসহ সারা পৃথিবীর ১৪০ কোটি মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসের ওপর আক্রমণ করে শতকোটি মানুষের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। সেই সাথে বাংলাদেশের সংবিধানও তারা লংঘন করেছে।**

মাত্র গুটি কয়েক কাদিয়ানী পৃথিবীর ১৪০ কোটি মুসলমানকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছে। ধৃষ্টতার চরম সীমা তারা লংঘন করেছে। সবথেকে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, কাদিয়ানীদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যা লঘু ঘোষণা করা একান্ত জরুরী। তাহলে বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে বাধ্য। যেমন নিরাপত্তা দিতে বাধ্য হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের। কিন্তু যতদিন কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেবে এবং পৃথিবীর ১৪০ কোটি মুসলমানদেরকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করবে, ততদিন তারা বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নিরাপত্তা লাভের অধিকার ভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে যেসব ধারা রয়েছে, তা একমাত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং বাংলাদেশের সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে হলে বাংলাদেশের কাদিয়ানীদের নিজেদের উদ্যোগেই নিজেদেরকে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করা উচিত।

কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করেছে কারা?

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে কাদিয়ানদেরকে অমুসলিম সংখ্যা লঘু ঘোষণা করার পর বাংলাদেশে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে তওহীদী জনতার রক্ত ঝরানোর পরে বর্তমান ৪ দলীয় জোট সরকার আহমাদিয়া মুসলিম জামাত নামধারী কাদিয়ানী গোষ্ঠীর সকল প্রকাশনা ও প্রচারণা গত ৮ জানুয়ারি '০৪ তারিখে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জোট সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের ওপর একটি কালির আঁচড় পড়েছে মাত্র। তওহীদী জনতার প্রাণের দাবী, কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা। সে দাবী এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। পক্ষান্তরে কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ হওয়ায় ৯ জানুয়ারী '০৪ তারিখ থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সেই মুখচেনা মহল অমুসলিমদের পদলেহী, ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক, মুরতাদ, ধর্মহীন-ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী, বাম-রামপন্থীরা কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করে মানবাধিকার, সংবিধান ও ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপের ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে মাঠ গরম করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

অপরদিকে কাদিয়ানী গোষ্ঠীর সকল প্রকাশনা নিষিদ্ধ করায় খুব স্বাভাবিকভাবেই এদেশের ১৪ কোটি তওহীদী জনতা আন্তরিকভাবে খুশী হয়েছে। দলীয় ও নির্দলীয় নাগরিক এবং রাজনীতিবিমুখ লোকজনসহ সর্বস্তরের মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। এজন্যে যে, এদেশের দল-মত ও পক্ষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মুসলিম জনসাধারণের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী হলো, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হোক।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও নাট্যশিল্পী আসাদুজ্জামান নূর, কবীর চৌধুরী, বদর উদ্দিন ওমর, রাশেদ খান মেনন, মনজুরুল আহসান খান, শাহরিয়ার কবির, তাসমিনা হোসেন, বিচারপতি কে, এম, সোবহান, ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ ও কিছু কিছু মগজবিকৃত বুদ্ধিজীবী, নামসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতা– যাদের ঈমান-আকীদা সম্পর্কিত জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব, এছাড়া ইসলাম বিদ্বেষী একশ্রেণীর সংবাদপত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করেছে।

বামনেতা জনাব বদরুদ্দীন উমর ইসলাম বিদ্বেষী এক চিহ্নিত পত্রিকায় বিশাল এক কলাম লিখেছেন। তিনি তার লেখার শুরুতেই জাতীয় মসজিদের সম্মানীত খতীবকে 'কুখ্যাত খতীব' বলে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। বাম ১১ দল প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকারের এ সিদ্ধান্তের। তারা বলেছে, কাদিয়ানীরা আইনের আশ্রয় নেবে। এক মতবিনিময় সভায় বিরোধীদলীয় নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কাদিয়ানীদের বইপুস্তক নিষিদ্ধ করে সরকার ধর্মের নামে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায়। তিনি বলেছেন, কে মুসলমান কে অমুসলমান তা নির্ধারণ করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এটা মানুষের ঠিক করার অধিকার নেই। তাহলে খোদার ওপর খোদাগিরি করা হবে। (দৈনিক ইনকিলাব, ১২ জানুয়ারি সংখ্যা)।

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার ক্ষেত্রে মূলত আপত্তি রয়েছে কেবল ঐসব চিহ্নিত বাম-রামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর, যারা ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও রাখেন না এবং আল্লাহ-রাসূল, ইসলাম তথা মুসলমানদের ঈমান-আকিদার ওপর আঘাত হানাকেই নিজেদের দায়িত্ব ও কতর্ব্য জ্ঞান করে। এরা ভিন্ন দেশের উচ্ছিষ্ট ভোগী, নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা ইসলামের শত্রুদের কাছে অর্থ লালসায় বিক্রি করে দিয়েছে বিধায় ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করাকে এরা নিজেদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করে। কাদিয়ানীরা তাদেরই অনুরূপ আল্লাহ-রাসূল, কোরআন, হাদীস তথা ইসলাম-মুসলমানদের প্রতি আঘাত করে থাকে, এ কারণেই এসব ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীন নাস্তিক গোষ্ঠী কাদিয়ানীদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মন্তব্য নিয়ে। তিনি একটি বিশাল দলের নেত্রী, সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ- বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তার দলের অধিকাংশ সদস্যই মুসলমান হিসেবে পরিচিত। তিনি কিভাবে কাফির কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করলেন?

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কাদিয়ানী সমর্থক অন্যান্যদের প্রতি প্রশ্ন, শেখ হাসিনা কি ভন্ড গোলাম আহমাদের প্রচারিত আহমাদী মুসলিম জামায়াত নামধারী কাদিয়ানীদের অনুসারী–না শেষনবী জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের অনুসারী? **বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ অন্যান্যরা যদি নিজেদেরকে কাদিয়ানীদের দলভুক্ত স্বীকার না করেন তবে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ভাষায় শেখ হাসিনাসহ অন্যরা মুসলমান নয়– কাদিয়ানীদের এই বক্তব্য কি তিনি মেনে নেবেন?** শেখ হাসিনাসহ কাদিয়ানীদের প্রকাশনা বাতিলের বিরোধিতা ও নিন্দাকারীদের নিকট প্রশ্ন রাখতে চাই- কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ঈমান-আক্বীদা বিধ্বংসী এসব প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করা কি মানবাধিকার পরিপন্থী হয়েছে?

শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সে সময় ১৯৯৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ধানমন্ডির ৩২ নম্বরস্থ শেখ মুজিবের বাড়ির কাছে সোবহানবাগ মসজিদে এক বিশাল সমাবেশে পবিত্র মসজিদে নববীর সম্মানিত খতীব আল্লামা ডক্টর আব্দুর রহমান বিন হোজাইফি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'কাদিয়ানীরা পবিত্র কোরআনুল কারীমের মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছে এবং মির্জা গোলাম আহমাদকে নবী বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে। সুতরাং তারা কাফির, তাদের যারা মুসলমান মনে করে তারাও কাফির।' সেদিনের সমাবেশে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদসহ দেশের কর্ণধারগণ উপস্থিত ছিলেন। বিরোধী দলীয় নেত্রী কি সেদিনের কথা বিস্মৃত হয়েছেন? **যাঁর মরহুম পিতা শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব জঘন্য কাফির কাদিয়ানীদের বিপক্ষে আজীবন অবস্থান করেছেন, তিনি কিভাবে কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করলেন?**

শেখ হাসিনা তাঁর শাসনামলে একজন কাদিয়ানী সমর্থক ব্যক্তিকে ইসলামী ফাউন্ডেশানের ডিজি পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে ওআইসি ফিকাহ্ একাডেমীতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তার নাম প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি কাদিয়ানী সমর্থক হওয়ার কারণে ওআইসি ফিকাহ্ একাডেমী তার নাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিরোধী দলীয় নেত্রী কি সে কথা ভুলে গিয়েছেন? **তিনি স্বয়ং কাদিয়ানীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাঁকে কাদিয়ানীরা মুসলমান মনে করে কিনা এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তারা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করবে কিনা। তাঁর কোনো মুসলমান আত্মীয়-স্বজনের সাথে কাদিয়ানীরা নিজেদের মেয়ের বিয়ে দেবে কিনা।** অবশ্যই কাদিয়ানীরা বিরোধী দলীয় নেত্রীকে মুসলমান বলে স্বীকার করেনা– কাফির বলে মনে করে। যে **গোষ্ঠী তাকে কাফির হিসেবে**

মনে করে, সেই গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে তিনি কিভাবে অবস্থান নিলেন?

জোট সরকার কর্তৃক কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার সমালোচনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, **'কে মুসলমান কে অমুসলমান তা নির্ধারণ করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এটা মানুষের ঠিক করার অধিকার নেই। তাহলে খোদার ওপর খোদাগিরি করা হবে।'** শেখ হাসিনা ঠিকই বলেছেন যে, কে মুসলমান কে অমুসলমান তা নির্ধারিণ করার দায়িত্ব আল্লাহর। কোনো মানুষ তা নির্ধারিণ করতে পারবে না। এ অধিকার মানুষের নেই। শেখ হাসিনার নিশ্চয়ই এটি অজানা নয় যে, স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ও তার সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানুষকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর ঈমান আনলে মুসলমান হওয়া যাবে। কোন্ কোন্ বিষয় অস্বীকার করলে অমুসলমান হয়ে যাবে। কোরআন-হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে সহজেই জানা যায় যে, ঈমান আর কুফ্র কি? বস্তুত নীতিগতভাবে মুসলমান কে আর মুসলমান কে নয় স্বয়ং আল্লাহ তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোরআন-হাদীস থেকে তা স্পষ্টই জানা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মুসলমানের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মূলনীতি প্রদান করেছেন, সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছেন, কোন্ কোন্ আমল-ইলেমের অনুশীলন করলে, কিভাবে নিজের জীবন পরিচালিত করলে মুসলমান বলা যায়।

কোরআন-সুন্নাহ্য় এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ থাকার পরও কি বলা যাবে না, কোন্ ব্যক্তি মুসলমান, কোন্ স্বভাবের মানুষ মুনাফিক, কোন্ মানুষ কাফির, কোন্ মানুষ ফাসিক, কোন্ মানুষ মুরতাদ? এ ব্যাপারে তো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেড় হাজার বছর পূর্বে আমাদেরকে কোরআন-সুন্নাহ্র মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত ও প্রদর্শিত নিয়ম-বিধি এবং আদেশ-নিষেধ প্রয়োগে শেখ হাসিনা বাধ সাধছেন কেনো? **কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার বিষয়টি যদি শেখ হাসিনার ভাষায় খোদার ওপর খোদাগিরি হয়, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঘোষণা করেছেন, তাঁর পরে কোনো নবী হবে না, যারা নবী দাবী করবে তারা মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। হযরত আবু**

বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈনসহ অগণিত সাহাবায়ে কেরাম, সারা পৃথিবীর ইসলামী আইনবীদগণ, হাদীস বিশারদগণ, কোরআনের মুফাস্‌সির ও গবেষকগণ ভন্ডনবীদের ব্যাপারে কাফির ফতোয়া দিয়ে ঐকমত্য পোষণ করে খোদার ওপর খোদাগিরি করেছেন? বরং আপনি এ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রসূত মন্তব্য করে নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ করেছেন।

আপনি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রীত্বের অভিলাষী এবং বর্তমানে বিরোধী দলীয় নেত্রী। আপনার বক্তব্যে দেশের অগণিত তওহীদী জনতা তো বটেই, স্বয়ং আপনার দলের তৃণমূল পর্যায়ের কর্মী-সমর্থকরা পর্যন্ত হতাশা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং সকল রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ, মুসলমান দাবী করার পরে এমন কোনো মন্তব্য করবেন না, যে কারণে ঈমানের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়। আর সামান্য গুটি কয়েক অমুসলিম কাদিয়ানীর ভোটের জন্য ইসলাম প্রিয় জনগোষ্ঠীর সমর্থন হারানো অবশ্যই বোকামীর শামিল হবে। জাতীয় পর্যায়ে কাদিয়ানীরা বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করে তাদের মতবাদ প্রচারের সাথে সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের প্রভাবিত করে তাদের পক্ষে কথা বলাতে চেষ্টা করছে এবং ক্ষেত্রে বিশেষে সফলও হয়েছে। কিন্তু কাদিয়ানীদের ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে নেতা-নেত্রীদেরকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। কেননা কাদিয়ানীদের বিষয়টির সাথে ঈমান ও কুফ্‌রের সম্পর্ক জড়িত।

মুসলমানদের প্রতি কাদিয়ানীদের প্রকাশ্যে হুমকি

পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঈমান নষ্ট করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। বিভিন্ন মুসলিম দেশে মন্ত্রী, সচিব, সামরিক ও বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের দলে টেনেই প্রথম কাদিয়ানীরা কাজ শুরু করে। ধীরে ধীরে সাধারণ নাগরিকদের মাঝেও তারা প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশেও উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী মহলে বেশকিছু কাদিয়ানী রয়েছে। যারা সবসময়ই এ ছদ্মবেশী অমুসলিম সম্প্রদায়টিকে মুসলিমরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বখশীবাজারে কাদিয়ানীদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত। রাজধানী ঢাকা শহরেই তারা মসজিদের নামে ৭টি উপাসনালয় স্থাপন করেছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে তাদের ১৩০টি কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে সংবিধান বিরোধী ও মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিধ্বংসী কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

সরাসরি ইয়াহূদী ও বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত এ বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সকল ষড়যন্ত্র থেকে মুসলমানদের ঈমান রক্ষার আন্দোলন চলছে। খত্মে নবুয়্যাত তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যাতের শ্রেষ্ঠত্ব, সার্বভৌমত্ব ও চূড়ান্ত হওয়ার ব্যাপারে এদেশের বিএনপি সমর্থক মুসলমান আর আওয়ামী লীগ সমর্থক মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ বিষয়ে একজন স্বঘোষিত নাস্তিক বা মুরতাদের কোনো কথা থাকতে পারে, একজন ইয়াহূদীর মতামত থাকতে পারে, কথা থাকতে পারে উপমহাদেশের মুসলমানদের কৌশলে অমুসলিম বানানোর ষড়যন্ত্রের হোতা বৃটিশ বেনিয়াদের। কিন্তু একজন বিশ্বাসী মুসলমানের মনে কাদিয়ানীদের এ অপকর্মের পক্ষে কথা বলার কোন ইচ্ছা কিছুতেই জাগ্রত হওয়া উচিত নয়। কাদিয়ানীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ বা তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ এটি নয়। এ হচ্ছে মুসলিম জনগণের ঈমান ও ধর্মীয় অনুভূতিতে অব্যাহতভাবে আঘাত করা একটি সম্প্রদায়ের খারাপ কাজগুলো প্রতিরোধ করা। মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা।

১৭/০১/০৪ তারিখের জনকণ্ঠ পত্রিকায় একটি উদ্বেগ জনক সংবাদ ছাপা হয়েছে। বাংলাদেশের কাদিয়ানী গোষ্ঠী একটি সম্মেলন করেছে এবং সেই সম্মেলনে এদেশের বাম-রামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিল। এসব নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে কাদিয়ানীরা বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করে বলেছে, 'সন্ত্রাস মোকাবেলা করা হবে।'

আমরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা করতে চাই, এদেশের তওহীদী জনতা, যারা নিজেদের প্রাণপ্রিয় আদর্শ ইসলামকে বিকৃতির কবল থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে খত্মে নবুয়্যাত আন্দোলন করছেন, তাঁরা কেউ কখনো সন্ত্রাসের সাথে জড়িত ছিলেন না এবং তাঁদের অভিধানে সন্ত্রাস শব্দটি অনুপস্থিত। বরং বিশ্ব সন্ত্রাসী ইয়াহূদীদেরকে নিজেদের প্রভু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, তাদের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়ে কৃত্রিম সন্ত্রাসের আবহ তৈরী করে কাদিয়ানীরাই ইসরাঈলের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী হিসেবে দেশের বুকে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এক রক্তাক্ত পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে না অথবা তাদের দুর্গম আস্তানা, প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত উপাসনালয়ে যে ভয়াবহ অশান্তি, অরাজকতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির কোনো নীল নক্শা প্রণয়ন করছে না, এর নিশ্চয়তা কে দেবে? সুতরাং সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থাকে কাদিয়ানীদের গতিবিধির ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। এ ব্যাপারে বাম-রামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর হুমকী-ধমকীর কানা-কড়িও মূল্য নেই।

বর্তমান জোট সরকারের নিকট দেশবাসীর দাবী হচ্ছে, কাদিয়ানীদের শুধু বই-পত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়– পৃথিবীর ৪০ টি মুসলিম দেশের অনুকরণে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশেও রাষ্ট্রীয়ভাবে জঘন্য কাফির কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।

তথ্যসূত্র

কোরআনুল কারীম, তাফসীরুল জামিউল আহকামুল কোরআন, তাফসীরুল জামিউল বায়ান, তাফসীরে দুররুল মানসুর, তাফসীরে ফাতহুল কাদির, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে রুহুল মাআ'নী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, তাফসীরে বাগ্‌বী, তাফসীরে ফখ্‌রুর রাযী, তাফসীরে তাবারী, তাফহীমুল কুরআন–আল্লামা মওদুদী (রাহঃ), ফী যিলালীল কোরআন– শহীদ সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ), বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌, নাসায়ী, বায়হাকী, রিয়াদুস্‌ সালিহীন, তাবারানী, মুসনাদে আহমাদ, যাদুল মাআ'দ, কাদিয়ানী সমস্য– আল্লামা মওদুদী (রহঃ), নবুয়্যাত ও রিসালাত, মাওলানা আঃ রহীম (রহঃ), সীরাতে সরওয়ারে আলম– আল্লামা মওদুদী (রহঃ), কাদিয়ানী রদ– আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটী (রহঃ), কাদিয়ানী মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ– আবু খালিদ।

Siratun-Nababiya by Abul Hasan Ali Nadvee. Siratun-Nabee by Allama Shibli Noomani., Al-Zihad by Allama Moududee, The Life of Muhammad by Muhammad Hosain Heykal., Encyclopeadia of Religion and Ethics, বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকাসমূহ।

অমুসলিম কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী ও পত্রিকা

মলফুজাতে আহমদিয়া, হাকিকাতুন নবুয়্যাত, আনওয়ারে খিলাফত, কালিমাতুল ফজল, আইনায়ে সাদাকাত, তাবলীগে রিসালাত, ইযাজে আহমাদী, সীরাতুল মাহদী, মুনকিরীনে খিলাফাত কা আনজাম, কিতাবুল বিররিয়া, ইযালায়ে আওহাম, আইয়ামুস সুলহি, কামারুল হুদা, মসীহ মাওউদ আওর খতমে নাবুয়্যাত, হুমামাতুল বুশরা, তাওদীদে মারাম, আনজামে আতহাম, আরবাঈন, চশমায়ে মসীহী, আল বুশরা, তিরয়াকুল কুলুব, তাযকিরা, আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, ইসলামী কোরবানী, ওহী মুকাদ্দাস, আন নবুয়্যাতু ফিল ইসলাম, খুতবায়ে ইলহামিয়া, বরকতে খিলাফাত, হাকীকাতুর রুইয়া, যমীমা তোহ্‌ফা, বারাহীনে আহমাদিয়া, কিশতীয়ে নূহ, সিত বচন, নাসীমে দাওয়াত, মাকতুবাতে আহমাদীয়া, নূরুল কুরআন, আকায়াদে আহমাদীয়া, নাহ্‌জুল মুসাল্লী, আল ফযল পত্রিকা, কাদিয়ান।

আল কোরআনের দিকে আহ্বান

মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত। কিন্তু এই নে'মাত মুসলমানদের কাছে মওজুদ থাকার পরও বিশ্বব্যাপী মুসলমানরাই সর্বাধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এর কারণ হলো, অধিকাংশ মুসলমানরা কোরআনের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালনা করছে না। মুসলমানদের হারানো গৌরব ফিরে পাবার জন্য কোরআন নির্দেশিত পথে ফিরে আসতে হবে। এ জন্য মুসলমানদেরকে কোরআন নির্দেশিত পথের দিকে আহ্বান জানানো আমাদের সকলের কর্তব্য। আমাদের বহুমুখী ব্যস্ততার কারণে আমরা ইচ্ছে থাকার পরও সকলকে কোরআনের পথে আহ্বান জানাতে পারছি না। ফলে অগণিত মুসলমান কোরআন নির্দেশিত পথের সন্ধান পাচ্ছে না।

মানুষ যেন সহজেই কোরআন নির্দেশিত পথের সন্ধান পায় এ জন্য গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক লিঃ-ঢাকা একটি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আপনি যে এলাকায় বাস করেন অথবা যেখানে আপনার কর্মক্ষেত্র, সে এলাকায় মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, পাঠাগার, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি রয়েছে। এসব স্থানে আপনি **তাফসীরে সাঈদী** উপহার দিয়ে কোরআনের প্রতি আহ্বান জানানোর দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করে মহান আল্লাহর রহমতের একজন অংশীদার হতে পারেন। আপনার উপহার দেয়া বা দান করা এই তাফসীর পাঠ করে একজন মানুষও যদি কোরআন নির্দেশিত পথের সন্ধান লাভ করে, তাহলে আপনার আমলনামায় নেকী জমা হবার যে শুভ সূচনা হবে, তা আপনার ইন্তেকালের পরও অগণিত বছর ব্যাপী জমা হতেই থাকবে। আর এর নিশ্চিত বিনিময় হলো, আপনি কিয়ামতের কঠিন দিনে উপকৃত হবেন– যেদিন কেউ কাউকে উপকার করার জন্য এগিয়ে আসবে না।

আপনি যদি কোথাও **তাফসীরে সাঈদী** উপহার দিতে চান অথবা আপনার মরহুম পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের লক্ষ্যে দান করতে চান তাহলে আপনার পরামর্শ মত নিম্নের নমুনা অনুসারে আপনার নামের একটি ব্যক্তিগত স্টীকার তাফসীর খন্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় লাগিয়ে দেয়া হবে।

তাফসীরে সাঈদীর এই খন্ডটি দান করেছেন

মুহ্তারাম/ মুহ্তারেমা..

এই তাফসীর খন্ডটি দান করার উসিলায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দানকারীর পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে পৃথিবী এবং আখিরাতে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

হে আল্লাহ! কোরআনের সম্মানে তুমি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো।

আল্লামা সাঈদী সাহেব কর্তৃক রচিত **তাফসীরে সাঈদী** অথবা অন্য যে কোনো গ্রন্থ দান করতে বা উপহার দিতে ইচ্ছুক হলে ফোন অথবা পত্রের মাধ্যমেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক লিমিটেড

৬৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

Why Qadiani's are not Muslim's?

কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী